মুক্তিস্নান

শচীনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

নিরঞ্জন প্রকাশালয়
৩।১।১, দুর্গাচরণ মিত্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

প্রকাশক :
শ্রীঅধীর বিশ্বাস
৩১।১, দুর্গাচরণ মিত্র স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

পুনর্মুদ্রণ : আষাঢ়, ১৩৭০

মুদ্রাকর :
শ্রীচন্দ্রশেখর দে
শ্রীকমলা প্রেস
২৭সি, কৈলাস বসু স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

উপহার

॥ এক ॥

প্রথম ডাকটা সে শুনতেই পায় নি। দ্বিতীয় ডাকটাই কানে যায় শান্তনুর। শান্তনু তো অন্য লোকেরও নাম হ'তে পারে। তাই তৃতীয় ডাকটার আশায় সে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। একটু অন্যমনস্ক হয়ে পথ চলেছিল সে। আজকে সন্ধ্যার মধ্যে কিছু টাকা তার চাই-ই। মেসের টাকাটা পুরো করে দিতে হবে। নতুবা এখানে থাকা তার দায় হয়ে উঠবে।

বন্ধু বিশ্বময়ের বাড়ির উদ্দেশ্যেই সে বেরিয়েছে। খুব বড়লোক ওরা। গরীব বলে তাকে উপেক্ষা করেনি কোনদিন। তাকে খুব ভালবাসে। ধনী বলে দেমাক নেই একটুও। সহপাঠিদের মধ্যে বিশ্বময়ের সেই একমাত্র অন্তরঙ্গ বন্ধু। আর যাদের সঙ্গে মেশে, শুধু প্রয়োজনের খাতিরে মেশে।

প্রয়োজন মতো অর্থ দিয়ে তাকে অনেকবার সাহায্য করেছে। পরে টিউশনির টাকা থেকে ধার শোধ দিয়েছে শান্তনু। অনেক সময় নিতে চায়নি বিশ্বময়। কিন্তু রাজি হয়নি সে। এমনিতেই সে অনেক সাহায্য পাচ্ছে তার কাছ থেকে। দান গ্রহণ করে নিজের বিবেকের কাছে ছোটো হতে ইচ্ছুক নয় শান্তনু।

মেয়ের কণ্ঠের তৃতীয় ডাকটা কানে যেতে ঘুরে দাঁড়াল শান্তনু। লম্বা ছিপছিপে চেহারা। মাথায় একরাশ কোঁকড়ানো চুল। চওড়া কপাল। পরণে হ্যাণ্ডলুমের পাঞ্জাবী আর সস্তা মিলের ধুতি। পায়ে কোলাপুরী চপ্পল।

নারী কণ্ঠের ডাক শুনে একটু অবাক হয়তো হয়েছিল শান্তনু। অবশ্য সুমিতাকে দেখে চিনতে দেরী হয়নি তার। শুধু কয়েক মুহূর্তের যা মৌনতা। আর দাঁড়িয়ে না থেকে কয়েক পা এগিয়ে জিজ্ঞাসা করে শান্তনু আমাকে ডাকছেন ?

দোকানের শেডের নীচে দাঁড়িয়েছিল সুমিতা। ক্লাসের ক'জন বন্ধুর সঙ্গে সে এসেছে।

—কতগুলো ডাক দিলাম বলুন তো?

সুমিতার এই স্বাভাবিক ভঙ্গীতে কথা বলায় যে জড়তাটুকু এসেছিল শান্তনুর তা উবে যায়।

—এখানে কি করছেন? বললো শান্তনু।

বাড়ির গেট পর্যন্ত সেদিন সে সুমিতাকে পৌঁছে দিয়েছিল। অনেক অনুরোধ করেছিল সুমিতা, বাড়ির মধ্যে ঢোকেনি শান্তনু। আর একদিন আসবে বলে কথা দিয়ে এসেছিল।

আর যাওয়া হয়নি তার। নিজের দুশ্চিন্তা নিয়ে ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়েছে সে। সামনে এম, এ পরীক্ষা। পাশ করতেই হবে।

—আর বলেন কেন। বন্ধুরা বাজার করবে, আমাকে ধরে নিয়ে এসেছে। আমি বাজারের কি বুঝি?

সুমিতা যে বোঝে অনেক কিছু, সেটাই প্রমাণ পেল তার কথার ধরণ দেখে। বাবা মা'র একটি মাত্র মেয়ে। ভীষণ আদুরে মানুষ। বাবা প্রফেসার, বড় হতেই কেনা কাটার ভার সুমিতার ওপর পড়ে।

জয়দেব বাবু ব্যস্তলোক। কলেজ, ছাত্র, তার উপর পাঠ্যপুস্তক লেখার চাপ থাকে। দোকান পাটের ভাবনা থেকে তিনি মুক্তি নিয়েছেন।

—এখন তো ব্যস্ত খুব। বললো শান্তনু।

—আপনার কি খুব তাড়া আছে?

শেডের বাইরে শান্তনুর কাছে এসে দাঁড়িয়েছে ততক্ষণে সুমিতা। কথা বলার সময় হাত দুটো খুব নাড়ে সে।

—একজন বন্ধুর সঙ্গে এক্ষুনি দেখা করতে হবে।

—সেদিন আমাদের বাড়ি গেলেন না। বললেন আসবেন, আর

এলেন না। প্রফেসার না হতেই এত ডাঁট। হলে তো আর কথাই বলবেন না।

—ঠিক তা নয়। আসুন না একদিন আমাদের মেসে। একটা আর্জেন্ট কাজে যাচ্ছি। দেরী হয়ে গেলে বাড়িতে পাবো না।

—আপনি তো আর আমাদের বাড়ি যাবেন না। আপনার জন্য বাবার কাছে আমি খুব বকুনি খেয়েছি। মাও কথা শুনিয়েছেন।

—আমি খুব লজ্জিত। ঠিক আছে, আমি যাবো এর মধ্যে।

—বিশ্বাস নেই। আপনি বরং আপনার ঠিকানাটা বলুন।

—আমার সঙ্গে কথা বলায় বন্ধুদের খুব ডিস্টার্ব হচ্ছে, তাই না?

—না না, ওরা কিছুই মনে করবে না। আপনি জানেন না, ওরা খুব ভালো মেয়ে।

—পরে আবার দেখা হবে।

শান্তনু মনে মনে ভেবে নিল। সুমিতার সঙ্গে কথা বলার চেয়ে বিশ্বময়কে বেশী প্রয়োজন। মেসের ম্যানেজার ভদ্রলোক তাকে ভালবাসে খুব। কিন্তু তিনিই বা আর কতদিন চেপে রাখবেন।

তাড়া না থাকলে সুমিতার সঙ্গ ছাড়তো না হয়তো শান্তনু। বেশ মেয়েটি। যেমনি সরল তেমনি মিশুক। কতটুকুই বা পরিচয় হয়েছে তার সঙ্গে।

সেদিনের সেই সকালটুকু শুধু। সে তো একরকম ভুলতেই বসেছিল। আজ নতুন করে দেখা না হলে হয়তো মন থেকে মুছে যেত তার কথা।

সুমিতাকে মেসের ঠিকানা দিয়ে বিদায় নেয় শান্তনু। এখানে আর দেরী করা তার উচিত হবে না। বিশ্বময় বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলে ফিরতে অনেক দেরী হবে তার।

বিশ্বময়ের বাড়িতে ঢুকতেই গেটের সামনে দেখা হয়ে যায় বিশ্বময়ের সঙ্গে।

—তোর কথাই ভাবছিলাম, চল্ আমাদের ফ্যাক্টরি থেকে একটু ঘুরে আসব।

গাড়ী চাবি ঘোরাতে ঘোরাতে বললে বিশ্বময়।

—তোর সঙ্গে একটা আর্জেন্ট কথা ছিল। বললো শান্তনু।

—চল্ ঘরে। শান্তনুকে নিয়ে নিজের ঘরে এলো বিশ্বময়।

—পঁচিশটা টাকার এখন ভীষণ প্রয়োজন। সন্ধ্যার মধ্যে মেসে দিতে হবে।

— এই কথা, বাকী টাকা দেওয়া হয়েছে ?

—হ্যাঁ, টিউশনির টাকাটা আজ পাওয়ার কথা, ভরসা নেই তো, যদি না দেয় আজ।

—বস্ দিচ্ছি।

বাড়ির ভেতরে ঢুকে যায় বিশ্বময়। নিজের হাতে এখন যা আছে দিলে কমে যাবে। মার কাছ থেকে পঁচিশটা টাকা চেয়ে নিয়ে এল সে। টাকাটা শান্তনুর হাতে দিয়ে বিশ্বময় বললো।—সন্ধ্যার সময় তো দেবার কথা। চল এখন ঘুরে আসি। গ্যারেজ থেকে গাড়ী বের করে দু' বন্ধু উঠে বসলো গাড়ীতে। গাড়ী ছুটে চললো বড় রাস্তা ধরে। অনেকটা যেতে হবে। সেই দমদমে ওদের কারখানা। যেতে যেতে শান্তনু বললো সুমিতার কথা। হঠাৎ আজ রাস্তায় দেখা হয়ে গেছে।

বিশ্বময় তাকে নিষেধ করেছিল, এখন যেন সে কোন মেয়ের সংগে না মেশে। সামনে এম, এ, পরীক্ষা, তাকে ফার্স্ট ক্লাস পেতেই হবে। পাশ করার পর যত খুশী প্রেম করুক, কোনো আপত্তি করবে না বিশ্বময়। বরং প্রয়োজনে তাকে সাহায্য করবে।

বিশ্বময় 'ল' পরীক্ষা দেবে। বি, এ, পর্যন্ত তারা এক সঙ্গে পড়েছিল। 'ল' তো একেবারেই পাশ করবে। খুব ভালো নম্বর পাবে। আইনটা জানা থাকা ভালো।

॥ দুই ॥

সকাল থেকে একটানা দুপুর পর্যন্ত পড়ায় মাথাটা ঝিমঝিম করে শান্তনুর। তাই দুপুরে স্নান খাওয়ার পর পড়ার বই না নিয়ে একটা গল্পের বই নিয়ে বসেছিল সে। মাথার ভারটা কমবে। মনটাও হালকা হবে অনেকটা।

সামনে পরীক্ষা তাই, নতুবা গল্পের বই কম পড়ে না শান্তনু। একটা কিছু নিয়ে তো ভুলে থাকতে হবে। অন্য কোন নেশা তো নেই যে তাকে সম্বল করে চলবে। আর সেই অর্থই বা কোথায় পাবে সে। পৃথিবীতে সে শুধু একা। আপন বলতে কেউ নেই তার। এক এক সময় খুব খারাপ লাগে। খুব অসহ্য লাগে। ছুটিতে মানুষ কত জায়গায় বেড়াতে যায়। কতজন আত্মীয়-স্বজনদের সংগে দেখা করে। আর সে এই শহরের এই মেসেই দিন কাটিয়ে দেয়।

তার আত্মীয়-স্বজন হয়তো অনেক আছে এই কলকাতা শহরে। কিন্তু কারোর ঠিকানা সে জানে না। আর এখন দেখলে তাকে কেউ চিনবে না। সেও তো চিনবে না কাউকে।

সেও ছোটো কিশোরটি তো নয় এখন। বড় হয়েছে। স্বাস্থ্যের পরিবর্তন হয়েছে অনেক।

বিশ্বময় বাড়ি নেই। কোম্পানীর কাজে খড়গপুর গেছে। ফিরতে এখনও দুদিন বাকী। এর মধ্যে না গেলে মাসীমা কথা শোনাবেন। বিশ্বময়ের যাওয়ার পর তার যাওয়া হয়নি ও বাড়ি।

বীণাকে তার আর একদম ভালো লাগে না। ভাইয়ের স্বভাবের পুরোপুরি বিপরীত হয়েছে বোনটা। বিশ্বময়ের মধ্যে কোন অর্থের

অহংকার নেই, তার কাছে ধনী গরীবের কোনো পার্থক্য নেই। প্রত্যেকের সঙ্গে সমান ভাবে মেশে সে, তার চাল-চলন কত সহজ কত সরল।

বীণা তার একেবারে সম্পূর্ণ বিপরীত। দারুণ দেমাকী মেয়ে। তার ওপর সুন্দরী বলে রূপের গর্ব তো আছেই। সাজসজ্জায় উগ্র আধুনিকা। বগলকাটা ব্লাউজ পরে সে। শাড়ীটা গায়ের সংগে এমনভাবে জড়িয়ে পরে, প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে তার মধ্যে। দেহের ভাঁজগুলো চোখের দৃষ্টিকে আকৃষ্ট করে।

তার একটু স্পর্শ পাওয়ার জন্য কিছু ছেলে হয়তো পাগল হয়। কিন্তু শান্তনু সে দলের নয়। সে সংযমী অল্প ভাষী। নিজের ভাগ্য সে নিজের হাতে তৈরী করছে। মোহের প্রলোভনে পড়ে তা সে নষ্ট করবে না।

বীণা তার যৌবন ভরা দেহ দিয়ে অনেককেই প্রলুব্ধ করতে পারে। এবং সে তা করছেও। অনেক ছেলে বন্ধু রয়েছে। এক একদিন এক একজনের সঙ্গে সে বেড়াতে বেরোয়। সিনেমা দেখে। বারে যায়! মদও খায়। নাচেও সে গায় ভালো।

বিশ্বময় একদিন দুঃখের সংগে বলেছে এসব কথা। শান্তনুকে সে বিশ্বাস করে ভালোওবাসে খুব। তার কাছে সে কোনো কথা গোপন করে না। বোনটা তার ভুল পথে যাচ্ছে। জীবনে আঘাত পাবে খুব।

বাবা এসব ব্যাপারে উদাসীন। কোনো কথায় তিনি কান দেন না। ব্যবসা নিয়েই ব্যস্ত সর্বক্ষণ। বাড়িতেই বা থাকেন কতক্ষণ। দুপুরে চাকর খাবার দিয়ে আসে অফিসে। যেদিন পার্টি না থাকে ফিরতে দশটা বাজে। পার্টি থাকলে তো কথাই নেই। বারোটা কি একটাও বেজে যায় এক এক দিন।

বীণার কথা তাঁর ভাববার সময় কোথায়। তার ওপর বীণাকে

তিনি ভালবাসেন খুব। তাই সখ করে তাকে লরেটায় ভর্তি করেছিলেন।

আগে বোনকে খুব ভালবাসতো বিশ্বময়, ধমকও দিতো। কিন্তু এখন আর কিছু বলে না সে। বলার বাইরে চলে গেছে বীণা। যা ইচ্ছে তাই করছে। বড় হয়েছে। নিজের ভাল মন্দ নিজেই বুঝতে শিখেছে।

বইয়ের মধ্যে ডুবে গিয়েছিল শান্তনু। "এ কালের কাব্য" বইটা তো ভালো। ঘরের দরজাটা ভেজানো ছিল। হঠাৎ দরজাটা নড়ে উঠতেই সে দিকে চোখ পড়লো তার। একটি মেয়ের হাত দেখতে পেল সে।

—কে? জিজ্ঞাসা করলো শান্তনু।

মনে পড়লো, স্মিতা ঠিকানা লিখে নিয়ে গিয়েছিল। নিশ্চয়ই সে এসেছে আজ। কোনো মেয়ের তো আসার কথা নয়।

—ভেতরে আসতে পারি? দরজার ওপাশ থেকে স্মিতা বললো।

—নিশ্চয়ই আসতে পারেন।

একটু জোর দিয়ে কথাটা বললো শান্তনু। আর কোনো ভূমিকা না করে স্মিতা ঘরে ঢুকে পড়ে। ছোটো ঘর। সিঙ্গল রুম। ঘরের চারদিক একবার চোখ বুলিয়ে নেয় স্মিতা। মেঝেটা অপরিষ্কার। টুকরো কাগজ ছড়ানো। ধূলো ভর্তি।

—ঘরটার কি অবস্থা হয়েছে দেখেছেন? বললো স্মিতা।

—দেখে আর কি হবে, আমি খুব নোংরা তাই না?

—আপনি খুব কুঁড়ে। টেবিলের কি হাল করেছেন দেখুন ত। বইগুলো তো গুছিয়ে রাখা যায়।

—কে আর করবে?

— খুব কঠিন কাজ নয় নিশ্চয়ই।

—তা নয়, সাজানো গুছানো মেয়েদের কাজ। ওসব আমার ধাতে আসে না।

—মেয়েদের কাজ তো ঘরে বসে রান্না করা। তারা অফিস করে কি করে?

—ঝগড়া করবেন বলে মনস্থ করে এসেছেন বুঝি?

—হুঁ অনেকটা তাই।

ঘাড় কাত করে তির্যক দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললো সুমিতা। সেই সঙ্গে তার শরীরটাও একটু দুলে ওঠে।

—আমি তাহলে তার আগেই সারেণ্ডার করছি। ঝগড়া আমি করতে পারব না। নিরীহ গোবেচারী মানুষ আমি। এ ব্যাপারে একেবারে অনভিজ্ঞ।

—মোটেই অতটা নন। আপনার জন্য আমাকে বাবা মা'র কাছে কথা শুনতে হয়েছে।

—কেন?

—আপনি যাননি বলে। তাঁরা তো বিশ্বাসই করছেন না আমি আপনাকে অনুরোধ করেছিলাম।

—আপনি বসবেন, না দাঁড়িয়েই কথা বলবেন?

সুমিতা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে টেবিলের বইগুলো নাড়াচাড়া করছিল শান্তনুর দিকে তাকিয়ে বললো এবার।

—বসতে বললেন কোথায়?

—খুব অন্যায় হয়ে গেছে। মন ভুলো মানুষ আমি। কাজ আছে খুব?

—আমি তো আপনার মতো খুব কাজের লোক নই। বাড়ি যাওয়া ছাড়া আর কোন প্রোগ্রাম নেই আপাততঃ।

—বেড়াতে বেরোলে মন্দ হত না।

—আমার মতো একটা মেয়েকে নিয়ে বেরোতে সম্মানহানি হবে না তো? না—এসে পড়ায় ভদ্রতা করছেন?

—আলাপটা একটু পুরোনো হলে গাঁট্টা মারতাম।

—ও বাবা! যতটা ভাল ভেবেছিলাম, ততটা নন। হাতও চলে তাহলে।

— প্রয়োজন হলে চালাতে হয়। পুরুষ তো।

—বটেই তো, সুদর্শন, বলিষ্ঠ যুবক।

শান্তনু দেখতে খুব সুন্দর। সুপুরুষ বলা চলে তাকে। যেমন তার দেহের গড়ন, তেমনি তার গায়ের রঙ। শান্তনুর যৌবনটাই বীণাকে আকৃষ্ট করেছিল খুব। শান্তনুকে সে কাছে পেতে চেয়েছিল।

বিশ্বময়ের বাড়ি আজ আর যাওয়া হলো না শান্তনুর। সুমিতার সঙ্গে বেড়াতে বেরোবার ইচ্ছেটা সে দমাতে পারলো না।

—আমি জামা কাপড়টা পরেনি তাহলে?

—ব্লেডটা একবার বুলিয়ে নিন মুখে।

—এদিকেও চোখ গেছে তাহলে।

—যাবে না। যার সংগে বেরোবো, সে পাগল না সুস্থ তা জেনে নেব না। পথে যদি কোনো বিড়ম্বনায় পড়ি।

— সেদিকেও চোখ আছে তাহলে?

—নিশ্চয়ই আছে। ঘরে ঢুকেই তো ঘরের হালচাল দেখে ফেললাম। মাঝে মাঝে সময় করে পরিষ্কার করে নেবেন।

—বসুন, আমি তৈরী হয়ে নিচ্ছি।

বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে শান্তনু।

সুমিতা খুব সেজে এসেছিল। এমনিতে সে খুব সুন্দর দেখতে। যত্ন করে অনেকক্ষণ ধরে সেজেছিল আজ। শান্তনুর মৌন প্রত্যাখ্যান তার কুমারী মনে দোলা দিয়েছিল। শান্তনুকে তার প্রতি আকৃষ্ট করতেই হবে। তাকে তার ভালো লেগেছে। প্রথম দর্শনেই সে

তার প্রেমে পড়ে গেছে। শান্তনুকে বিশ্বাস করা যায়। ঠকার ভয় নেই।

সুমিতা খুশী হলো খুব। সে শুধু ভাবছিল শান্তনু তাকে বলুক বেড়াতে বেরোবার কথা, নতুবা তাকে বলতে হবে শেষ পর্যন্ত।

॥ তিন ॥

সুমিতা বাবা মা'র একমাত্র সন্তান। খুব আদরের। কিছুদিন আগেও সে বাবার সঙ্গে এক সাথে খেয়েছে। মা মাঝে মাঝে একটু যা বকাবকি করেন।

তিনি তো সেকেলে মেয়ে। মেয়েদের এই স্বাধীনতা অন্তর দিয়ে এখনও মেনে নিতে পারেন নি। ফ্রক ছেড়ে শাড়ী ধরতেই তাঁরা ঘরে বন্দী হয়েছিলেন। বিয়েও হয়ে গিয়েছিল। মাথার ওপর কর্তব্যের চাপ এসে পড়েছিল।

কিন্তু আশ্চর্য, সুমিতা এত বড় হয়েছে, তবু এখনও দায়িত্ব জ্ঞান হয়নি। কর্তব্য বোধ জাগেনি, মা'র কাজে সাহায্য করা তো দূরের কথা বরং আরো কাজ বাড়িয়ে তোলে। রান্না ঘরের দিকে যাবার ইচ্ছে মোটেই নেই।

জয়দেববাবু অতি নিরীহ ভদ্রলোক। তিনি তাঁর বই পত্তর নিয়েই ব্যস্ত সর্বক্ষণ, কলেজের লেকচার তো রয়েছেই তার ওপর ছাত্রও পড়ান কয়েকটা। দিনকাল যা পড়েছে শুধু কলেজের টাকায় চলতে চায় না মাস। তিনি একটু আয়েসী। একটু বিলাসীও।

খাবার ব্যাপারে যত বাবুয়ানা জয়দেববাবুর। এই দুর্দিনেও সরু চালের ভাত খাচ্ছেন তিনি। এই জন্য অনেক দাম দিতে হচ্ছে

তাঁকে। সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই তাঁর। অর্থটাকে তিনি কোন দিনই খুব গুরুত্ব দেননি।

ভবিষ্যতের সঞ্চয়ের জন্য অর্থ নয়। অর্থ হচ্ছে মানুষের জীবন ধারণের জন্য। সঞ্চয়ের প্রয়োজন আছে, তা বলে আত্মাকে কষ্ট দিয়ে নয়। আত্মাকে উপবাস রেখে কোন ধর্ম করা যায় না; তা ফলপ্রসূ হয় না।

মেয়ের জন্য স্ত্রীর কাছে জয়দেববাবুকে প্রায়ই কথা শুনতে হয়।

তুমি লাই দিয়ে দিয়ে মেয়ের মাথাটা খেলে।

এক একদিন মেয়ের উপর খুব রেগে স্বামীকে বলতেন, মনের সব রাগ ঢালতেন স্বামীর উপর। মা রেগে গেলে সুমিতা কথাই বলতো না তখন। কোনো একটা বই নিয়ে চুপচাপ পড়া শুরু করে দিতো। সুমিতা খুব ঠাণ্ডা মেয়ে। বাবার মতই মেজাজটা তার হয়েছে।

আর পাঁচটি মেয়ের তুলনায় বাইরে বেশিক্ষণ থাকলেও, অন্যায় ভাবে সময় নষ্ট করে না সুমিতা। কলেজ ইউনিয়নের সে একজন কর্মক্ষম নেত্রী। সংগঠন মূলক কিছু কাজ করে সে। পাড়ায় সে এমনি জনপ্রিয়তা অর্জন করেনি। ছোটদের কাছে সুমিতাদি, বড়দের কাছে সুমি। পাড়ার প্রত্যেকটি লোক সুমিতাকে ভালবাসে।

মা এমনি সময় মেয়ের প্রশংসায় পঞ্চমুখ; সুন্দর সুশ্রী, সে তো আছেই। ওতো প্রকৃতির দান। কলেজের অত মেয়ে মধ্যে তার মেয়েকে চেনে না এমন মেয়ে খুব কম আছে। পাড়ায়ও তাঁর মেয়ের যথেষ্ট সুনাম আছে, তার উপর তাঁর মেয়ে ভালো গান গায়। অনেক জায়গা থেকে গান গাইবার অনুরোধও আসে।

জয়দেববাবু স্ত্রীর অভিযোগ নীরবে মেনে নেননি। তিনি অবশ্য মেয়েকে স্বাধীনতা দিয়েছেন অনেক। বাড়ি ফিরতে যেদিন

সন্ধ্যা হয়ে গেছে, সেদিনও সুমিতার কাছে কৈফিয়ৎ তলব করেন নি।

সন্ধ্যা অবশ্য সুমিতার খুব কম হয়েছে। বিকেলে বেড়াতে বেরিয়েছে যেমন, সন্ধ্যার আগেই বাড়ি ফিরেছে। শুক্রবারটা বাড়ি ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে যায়। সুমিতা সেদিন গানের মাষ্টার মশায়ের বাড়ি যায়।

এ সপ্তাহের সোমবারে সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল সুমিতার। একটু রাত হয়েছিল বাড়ি ফিরতে। বাড়িতে সে বলেই বেরিয়েছিল একটু দেরী হতে পারে।

সুমিতা তার দুজন ক্লাসের বন্ধুর সঙ্গে কফি হাউসে এসে ঢোকে। সুমিতা ভিড়ের মধ্যে শান্তনুকে দেখতে পায়নি। একটা খালি টেবিল দেখে সেদিকে পা ফেলেছিল।

চক্রবর্তী বলে ডাকতেই কথাটা কানে যায় সুমিতার। খুব চেনা গলা। শান্তনু এখন তার খুব চেনা, খুব পরিচিত।

—চোখ তুলে তাকাতেই শান্তনুকে দেখতে পায় সুমিতা। দু'জন বন্ধুর মধ্যে একজন চেনে না শান্তনুকে। তাপসী চেনে। সে একবার মেসে গেছে সুমিতার সঙ্গে। অপর মেয়েটি খুব আস্তে বললো।

—কে ভদ্রলোকটি?

সুমিতার বলার আগে তাপসী বললো ওই মেয়েটিকে।

—সুমির বয় ফ্রেণ্ড। পাশাপাশি খুব কাছাকাছি হয়ে বসলো সুমিতা।

· একা একা বসে কেন?

ভাবছিলাম মৃত্যুর আর ক'দিন বাকী।

ভারিক্কী চালে কথাটা বললো শান্তনু।

—আপনি কি কাপুরুষ? এর মধ্যেই মৃত্যুর কথা ভাবছেন? জীবন তো সবে শুরু।

বেশ সহজ ভাবেই কথাটা বললো তাপসী। সেদিন মেসে ভালভাবে কথা বলতে পারেনি। প্রথম পরিচয়। একটা লজ্জার জড়তা ছিল তার। তাই একবার দেখার পর থেকেই মনকে সহজ করে তুলেছে তাপসী। তাকে নিশ্চয়ই সেদিন খুব বোকা ভেবেছিল।
—আমার এই বন্ধুটির সংগে পরিচয় হয়নি, এর নাম কাজল।

সুমিতা তার দিকে তাকাতেই, বলার সুযোগ না দিয়ে নিজেই নিজের পরিচয় দেয় শান্তনু।

—আমার নাম শান্তনু চট্টোপাধ্যায়। ষ্টুডেণ্ট বলতে পারেন।

বলল সুমিতা। এবার এম. এ. পরীক্ষা দিচ্ছেন। ফার্ষ্ট ক্লাস পাবেই।

—তোমাকে আর আমার পাবলিসিটি করতে হবে না।

সুমিতাদের বাড়িতে গিয়েই যত গণ্ডগোল। প্রথমদিন মা কিছু না বললেও দ্বিতীয় দিন তিনি শান্তনুকে চেপে ধরেছিলেন।

—একী বাবা! সুমি তোমার চেয়ে কত ছোটো। শুধু বয়সে নয়, শিক্ষায়-দীক্ষায়ও সে তোমার চেয়ে অনেক নীচুতে। তুমি কিনা ওকে আপনি করে কথা বলছো।

—তাতে কি আছে মাসীমা। সুমিতা বড় হয়েছে তো।

খুব নম্র কণ্ঠে বলে শান্তনু। মা'র পিছনে দাঁড়িয়ে মুখ টিপে টিপে হাসতে থাকে সুমিতা। কেমন মজা! মা'র কাছে চালাকিটি চলবে না। সুমিতা নিজেই একবার বলেছিল শোনেনি তখন শান্তনু।

সে বলেছিল, ভদ্রভাবে কথা বললেই হলো। 'তুমি' বলার দিন তো আর ফুরিয়ে যাচ্ছে না।

অগত্যা মাসীমার কথা মেনে নিতে হয় শান্তনুকে। তুমি বলতে

তার কোন আপত্তি ছিল না। আর কিছুদিন অপেক্ষা করবার ইচ্ছে ছিল শান্তনুর।

উঠবার আগে, পরের দিনের প্রোগ্রামটা ঠিক হলো তাদের। সুমিতা বলতে পারেনি কিছুই। সংগে তার বন্ধুরা রয়েছে।

এমনিতে বন্ধুরা বলেছে খুব। তাপসী তো হাসতে হাসতে বলেছিলো শান্তনুকে—আপনার এই গার্ল ফ্রেণ্ডটি আপনার প্রশংসায় পঞ্চমুখ, আপনার প্রেমে পড়ে গেছে।

লজ্জায় সুমিতার ফর্সা মুখ লাল হয়ে উঠেছিল। কিছুক্ষণের জন্য সে মুখ তুলে তাকাতে পারেনি। মুখ নীচু করে আঙুলের ডগাগুলো খুঁটেছিল।

বেশ লাগছিল দেখতে সুমিতার রক্তিম মুখখানা শান্তনুর কটা চুল এসে পড়েছিল তার মুখের উপর, সুমিতার ওই কোমল রাঙা ঠোঁট দুটোয় চুমু খেতে ইচ্ছে হচ্ছিল খুব।

বেড়াতে বেরিয়ে সোমবার দুজনেই দুজনের কাছে খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে এসেছিল। সুমিতার উপর দুর্বলতা এলেও শান্তনু নিজেকে সংযত রেখেছিল খুব। সে তার ব্যক্তিত্ব আর গাম্ভীর্য দিয়ে মনকে চেপে রেখেছিল, কিন্তু তার দুর্বলতা সেদিন প্রকাশ হয়ে পড়ে।

অহেতুক অনেক কথা বলেছিল শান্তনু। নিজের কথাও বলেছিল অনেক। একদিন তাদের অবস্থা খুব ভাল ছিল।

উত্তরবঙ্গে তাদের বাড়ি ছিল, জমি ছিল, বাবার ছোটো-খাটো ব্যবসাও ছিল। নিঃসম্বল সে ছিল না।

মনে আছে সে সব কথা শান্তনুর। তখন তার বয়স বছর বারো হবে। বাবা হঠাৎ মারা গেলেন দু'দিনের জ্বরে। এক কাকা ছিল তার। এক সঙ্গেই ছিলেন তাঁরা। বিষয় সম্পত্তি কাকাই দেখতেন। বাবা ভালো বুঝতেন না। বাবা খুব সরল প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। ওই তল্লাটে এখনও অনেকে বাবার নাম করে। বাবার সরল

বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে তলে তলে কাকা পুকুর চুরি করেছে। বাবা থাকতে তা বুঝতে দেননি কাকা। বাবার মৃত্যুর পর দেখা গেল।

পুরোনো চাকর রঘুনাথ খুব ভালবাসতো শান্তনুকে। অজস্র অভিশাপ বৃষ্টি বর্ষণ করতে করতে তাকে নিয়ে বেরিয়ে আসে সে ওবাড়ি থেকে। পিসির বাড়ীতে শান্তনুকে রেখে সে কাজের খোঁজে অন্যত্র যায়।

পিসির বাড়িতে বড় হ'তে থাকে শান্তনু। ক'মাস পরে অন্যত্র উঠে যাওয়ায় রঘুনাথের সংগে যোগাযোগ থাকে না শান্তনুর।

অনেক দিনকার কথা এসব। রঘুনাথের কোনো খবরই সে জানে না। পিসিমা বেঁচে নেই। পিসেমশাই আগে মারা গেছেন। তাঁর দু'ছেলে দু'জায়গায় রয়েছে। ছেলে দুটি শান্তনুকে মোটেই দেখতে পারত না।

সুমিতার সুখী জীবন। নিজের কাহিনী বলতে কিছুই তার নেই। সে বলেছিল প্রদীপ দত্তর কথা, লোকটি তার পিছু নিয়েছে খুব। তাকে বিয়ে করবার খুব ইচ্ছে।

প্রদীপ দত্ত তাদের বাড়ীওয়ালা, গেট পেরিয়ে ভেতরে ঢুকতেই প্রথম ঘরে প্রদীপবাবু থাকেন। বাবা নেই, মা আছেন, তিনি কাশীতে আছেন। প্রদীপবাবু একা থাকেন।

তারপরে দু'খানা ঘর সুমিতাদের। তারপর আরও দু'ঘর ভাড়াটে আছে ও বাড়ীতে। প্রদীপ লোকটি বিশেষ সুবিধের নয়। তার সম্পর্কে অনেক কথাই সে শুনেছে। সে মদ খায়। অনেক বাজে মেয়ের সঙ্গে ঘোরে, অনেক রাত করে বাড়ী ফেরে। কোনো আত্মীয়-স্বজনের সংগেও সদ্‌ভাব নেই। কেউ আসেনা তার কাছে।

একটা রেষ্টুরেন্ট আছে প্রদীপ দত্তর। ভালো পয়সা পায় সেখান থেকে। তার ওপর ভাড়াতো পাচ্ছেই প্রতি মাসে। স্কুল ফাইনালের পর আর পড়েনি।

প্রদীপ দত্তকে দেখেছে শান্তনু। বেশ দেখতে ছেলেটিকে। বেশ ভদ্র বলেই মনে হয় প্রথম নজরে।

কথায় কথায় সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল সেদিন। খোলা হাওয়ায় সেদিন ওরা যেন অজানা দরিয়ায় হারিয়ে গিয়েছিল। কখন যে সুমিতার একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে তুলে নিয়েছিল শান্তনু তা জানে না। বোটানিকেল গার্ডেনে বেড়াতে এসেছিল তারা। একটা নির্জন জায়গা দেখে একটা গাছের তলায় জলের ধার ঘেঁসে বসেছিল।

—বাড়ী ফিরতে অনেক রাত হয়ে যাবে তাই না? বলল শান্তনু।

—তোমার সঙ্গে রয়েছি, ভয় কি আমার। অগাধ বিশ্বাসে নিজেকে শান্তনুর উপর ছেড়ে দিতে আর কোনো শঙ্কা নেই সুমিতার। নতুন প্রাণের ঘ্রাণে সে আজ অভিভূত। সব চিন্তার জাল থেকে সে এখন মুক্ত। দুর্ভাবনার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেল এতদিনে, সঙ্গী নির্বাচনে নিশ্চয়ই তার ভুল হয়নি।

রাজপ্রাসাদ আর রাজপুত্র সে আশা করেনি। তবে স্বপ্ন ছিল সীমাবদ্ধ। একটি ছোট সংসার সে মনে মনে কল্পনা করেছিল। শান্তনুর মত ছেলে তার দেহ মন রসে গন্ধে ভরিয়ে তুলতে যথেষ্ট। মাকে সেদিন কথায় কথায় বলেছিল সুমিতা।

—ছেলেটিকে তোমার কেমন লাগে মা?

—মন্দ নয়, বেশ ভদ্র আছে।

—বাবার তো বেশ ভাল লেগেছে।

—লাগবেই তো। একই লাইনের যে। নিজে সারাটা জীবন বই মুখে করে কাটালো, দু'দণ্ড কথা বলার জো আছে ভালো করে।

—পণ্ডিতরা একটু বইপ্রিয় হয়েই থাকে। শান্তনু অত্যন্ত বই ভালবাসে।

—হতেই হবে, তোর বাবার মতো বয়সের সময় বইএর মধ্যেই মুখ গুঁজে থাকবে হয়তো।

প্রদীপ দত্তর গলার আওয়াজ পেতেই কথাটা সেদিন এখানেই থেমে যায়। এই ছেলেটির প্রতি মা'র একটু দুর্বলতা আছে। মা'র কাছে লাই পাওয়ায় যখন তখন ও এসে হাজির হয়।

ওর এই ভালো মানুষী ভাবটা সইতে পারে না সুমিতা। কম মেয়ের সঙ্গে তো মেশেনি সে, তার দিকে হাত না বাড়ালেই নয়। সুন্দর সে হতে পারে, তার চেয়েতো অনেক সুন্দর মেয়ে রয়েছে বাংলা দেশে। পাত্র হিসাবে তো অপাত্র নয়। খবর পেলে মেয়ের বাবারা এসে ভিড় করবে। স্বাস্থ্যবতী সুশ্রী একটি মেয়ে দেখে নিয়ে তাকেই তো বিয়ে করতে পারে প্রদীপবাবু।

বাবা অবশ্য ছেলেটিকে পছন্দ করেন না একটুও। বাবার কথায় ছেলেটি বকাটে। বাবার সংগে তেমন ভাব নাই। প্রশ্রয় দেন না তিনি প্রদীপকে একেবারে।

॥ চার ॥

গতকাল বীণা রায়ের বাড়ি ফিরতে অনেক রাত হয়েছিল। প্রায় তখন এগারটা হবে। এত রাত বড় একটা হয় না। ন'টার মধ্যে প্রায় প্রতিদিন বাড়ী ফেরে সে।

ন'টা নাগাদ ফোন করেছিল সে বাড়িতে। পার্টিতে আটকে গেছে সে। ফিরতে একটু দেরী হবে। সেই দেরীটা তার এগারটায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। ফেরার পথে প্রদীপ সংগে ছিল তার। বাড়ীর গেটে এসে ট্যাক্সী থেকে নামিয়ে দেয় সে বীণাকে।

—যেতে পারবেন তো এটুকু ?

—খুব পারবো। সুস্থ হয়ে গেছি।

গলার স্বরে একটু জড়তার ভাব ছিল বীণার।

—কাল চারটের সময় আবার দেখা হচ্ছে আমাদের।

—তাপস অবশ্য রিং না করলে। ওকে কথা দেওয়া আছে। গাড়ীর হ্যাণ্ডেলটা ধরে দাঁড়িয়েছিল বীণা।

—তাপসের সংগে আমায় তাল পেলেই একদিন আলাপ করতে হবে।

—বড় ভালো ছেলে। একদিন আলাপ করিয়ে দেব।

—ঠিক আছে। আজ বাড়ি যান, অনেক রাত হলো।

—গুড্ নাইট্।

—গুড্ নাইট্।

হাতে হাত লাগিয়ে শেষ বিদায় নেয় বীণা দরজার দিকে পা ফেলে। পা দু'টো তখনও তার একটু একটু কাঁপছে।

রঘু গাড়ীর শব্দ পেয়ে ওপর থেকে নীচে নেমে এসেছিল। দরজা খুলে দেয় সে।

—কে কে জেগে আছে?

—বাবু ঘুমিয়ে পড়েছেন। দাদাবাবু তাঁর ঘরে পড়ছেন।

বললো চাকর রঘুনাথ।

—দাদার ঘরের দরজা কি খোলা?

—না বন্ধ।

—আমি কিছু খাবো না। দাদা যেন টের না পায়; তুই চুপচাপ আমায় নিয়ে চল্ আমার ঘরে।

এ কাজ নতুন নয় রঘুর কাছে। দিদিমণিকে নিয়েই যত বিভ্রাট রঘুর। ফরমাসতো তার লেগেই আছে। কিছু একটা আনতে দিলে তার ফিরতি পয়সা সে আর ফেরৎ নেয় না। মনটা খুব ভালো। কৃপণ নয় সে।

দাদাবাবু খুব গম্ভীর প্রকৃতির। কথা কম বলে। তাঁর কাজ নিয়েই সে ব্যস্ত। প্রয়োজন না পড়লে কাউকে সে ডাকে না।

দিদিমণি তার একেবারে বিপরীত। এত কথা বলে যে কোন্‌টা কাজের কথা ধরা যায় না অনেক সময়। খুব হাসিখুশি। কোনো সময় রাগলেও মুখ ভার করে বেশিক্ষণ থাকতে পারেনা।

রঘুর কাঁধে ভর দিয়ে নিজের ঘরে এসে ঢোকে বীণা। ভয় এ বাড়ীতে সে এক দাদাকেই করে। দাদা খুব ধমকায় তাকে। মা বাড়ী নেই। তার এক ভাইএর ছেলের মুখে ভাতে গেছে। শরীরটা খুব ক্লান্ত লাগছিল বীণার। তার ক্লান্তির সুযোগ নিয়ে প্রদীপ সারাটা রাস্তা তাকে জ্বালিয়েছে। তাকে নিজের কাছে টেনে নিয়ে বাঁ হাতটা তার কাঁধের ওপর তুলে দিয়েছিল।

মদের মাত্রাটা একটু বেশী হয়ে পড়ায় তাকে এমনি খুব কাবু করে ফেলেছিল। তার ওপর কয়েক জনের সংগে তাকে নাচতে হয়েছিল। বলড্যান্স তবুও নাচা যায় অনেকক্ষণ। টুইসে খুব পরিশ্রম হয়।

প্রণব পার্টি দিয়েছিল তাদের ক্লাবঘরে। কেসে সে জিতেছে। পঁচিশ হাজার টাকার কেস। হাইকোর্ট থেকে রায় হয়ে গেছে। ক্লাবের কয়েকজন সাক্ষী দিয়েছিল প্রণবের পক্ষে।

খরচার কার্পণ্য করেনি প্রণব। খাবারের সংগে সংগে জলের আয়োজন করেছিল খুব। তন্দ্রা তরফদার হয়তো আর আসবে না এই ক্লাবে।

মেয়েটি খুব সুন্দরী। দেহের গড়ন এবং স্বাস্থ্য খুব আকর্ষণীয়। ভীষণ দেমাকী। অর্থের অহঙ্কার তো আছেই তার উপর রয়েছে রূপের গর্ব। চোখে মুখে যেন বিদ্যুতের কটাক্ষ।

তিমিরের সঙ্গে খুব ভাব। তিমিরের সংগে ক্লাবে আসতো। কলকাতায় নতুন এসেছে। উত্তর প্রদেশের কোন শহরে যেন বাবার বিরাট ব্যবসা আছে। অনেক লোক নাকি তাদের সেই কারখানায় কাজ করে।

কলকাতায়ও ব্যবসা শুরু করছে। দাদা এটা দেখা শোনা করবে। তুই দাদা। নতুন বাড়িও কিনেছে একটা। এক দাদার সবে বিয়ে হয়েছে। দাদার সঙ্গে কলকাতায় থাকবে তন্দ্রা।

তিমির হচ্ছে তার দাদার শালা। তিমিরের সঙ্গে কথা হয়েছিল তন্দ্রার ডাঁট একদিন ভাঙতে হবে। ছেলেদের অনেকেরই চোখ পড়েছিল তন্দ্রার ওপর। মেয়ে তো আরও রয়েছে। আর কারোর ওপর কোনো লোভ নেই তাদের।

তিমিরের সঙ্গে তন্দ্রা আসতেই গ্লাসে ঢেলে কোকোকোলা দিয়েছিল। সুতপাই দিয়েছিল নিয়ে গিয়ে। তিন পেগ রাম তার মধ্যে মিশিয়ে দিয়েছিল সুশান্ত।

কিছুক্ষণ বাদে প্রণব এক গ্লাস এনে দিয়েছিল কোকোকোলা। তার মধ্যেও ছিল খানিকটা রাম আর জীন। মদ কোনদিন মুখে ঠেকায়নি তন্দ্রা। বুঝতে না পেরে সে খেয়ে ফেলে এবারও। সকলেই খাচ্ছে, সন্দেহ হয়নি। তাকে জব্দ করার জন্য ষড়যন্ত্র হয়েছে ভাববে কি করে।

ভীষণ নেশা হয়েছিল তন্দ্রার। তাকে নিয়ে ছেলেদের মধ্যে সে কি মাতামাতি। গায়ে কাপড় থাকা দায়। ডেক্রোনের শাড়ী পরে এসেছিল সে, আঁচলটা সর্বক্ষণ লুটিয়েছে মাটিতে। কোনো হুঁস ছিল না। যার কাছে কেউ ঘেঁসতে পারেনি ; তার ঠোঁটে কয়েকশো চুম্বন পড়েছিল।

অন্যদিন একাই বাড়ী ফেরে বীণা। কাল আর একা ফিরতে সাহস হয়নি। নেশাটা কাটেনি সম্পূর্ণ। তার ওপর খুব টায়ার্ড। এই রাতে ট্যাক্সীতে একা ফেরা ঠিক হবে না। তাই প্রদীপের সংগে সে এসেছিল।

প্রদীপের কাঁধে মাথা রেখেছিল বীণা। কিন্তু প্রদীপের সেই দুষ্টুমি স্বভাব তো যাবার না। এত রাতে এতটা পথ তাকে একা পেয়ে

লক্ষ্মী ছেলের মতো চুপ করে থাকার ছেলে প্রদীপ নয়।

প্রদীপ বেশ সুস্থই ছিল। বীণার ঘুমের ভাব এসেছিল। আঁচলটা তার গায়ে ভালো করে টেনে দেয় প্রদীপ। একটা হ ত তার কোলের ওপর দিয়ে, কাঁধে মাথা রেখে চোখ বুজে বসেছিল বীণা।

গাড়ীর ভেতরটা বেশ অন্ধকার ছিল। রাস্তার দু'ধারের দোকান বন্ধ হয়ে যাওয়ায় আলোর রশ্মি এসে পড়ার সম্ভাবনা নেই। পরম নিশ্চিন্তে কাঁধের ওপর থেকে তার মাথাটা কোলের কাছে তুলে এনেছিল প্রদীপ। বাঁ হাতের ওপর বীণার মাথাটা রেখে ডান হাত দিয়ে আঁচলটা টেনে দেয় বুকের ওপর থেকে।

ঘুম ভাঙতে আজ দেরী হয়ে যায় বীণার। বেলা প্রায় তখন আটটা বাজে। ঠাকুর চা দিতে এসে একবার ডেকেছিল বীণাকে। সাড়াও দিয়েছিল বীণা ঘুমের মধ্যে। কিন্তু ঘুমের নেশা তখনও কাটেনি তার।

বেড টি ঠাণ্ডা হয়ে যায়। বীণা আবার ঘুমিয়ে পড়ে।

ঠাকুর আর এঘরে আসেনি। সকালটা তাকে রান্নার কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়। বাবু খেয়ে বেরোবে দশটার মধ্যে। তার একটু পরেই দাদাবাবু খাওয়ার তাড়া দেবে। দিদিমণিও তাড়া দেবে। কলেজে যাবে দু'জনে।

রঘুনাথ বাজারে গিয়েছিল। কাজে ব্যস্ত থাকায় বীণাকে গিয়ে আর ডাকতে পারেনি আজ।

শিবনাথ বাবু সকালে উঠেই অফিসের কাগজপত্র নিয়ে বসে যান। অন্যদিন মেয়ে এসে এ ঘরে তাঁকে বিরক্ত করে। বীণা না আসায় একাগ্রচিত্তে কাজের মধ্যে ডুবে গেছেন তিনি। এত বড় কারখানা। কোনো পার্টনার নেই তার। একমাত্র মালিক তিনি। মুনাফাটা তিনি যেমন একাই মোটা পান, কাজের ঝক্কিও তাঁকে একাই পোহাতে হয়।

দিদিমণিকে না দেখতে পেয়ে রঘু এসে তার ঘরে ঢোকে। দাদা বাবু তার ঘরে বসে পড়ছে। বীণাকে সে ডাক দেয়। ঘুম ভেঙে যায় তার। উঠে বসে বীণা।

—অনেক বেলা হয়ে গেছে। আমাকে আরও আগে ডাকোনি কেন?

—আমি কি বাড়িতে ছিলাম? বললো রঘু।

—কোনো ফোন এসেছিল আমার নামে?

—না।

ঘর থেকে বেরিয়ে গেল রঘুনাথ।

হাত মুখ ধুয়ে এসে বই নিয়ে বসে বীণা।

আজকে প্রফেসার মৈত্রের ক্লাস আছে। একেবারে তরুণ প্রফেসার। খুব সুন্দর দেখতে।

॥ পাঁচ ॥

বিশ্বময়ের বাড়ীতে যাওয়া একেবারে কমিয়ে দিয়েছে শান্তনু। বীণার ওই গায়ে পড়া ভাবটা তার ভালো লাগেনি একটুও। বীণা হয়তো তাকে তার বন্ধুদের দলে ফেলে থাকবে। বীণার সঙ্গে পাল্লা দেবার ক্ষমতা তার নেই। সেই স্পৃহাও নেই শান্তনুর। বামন হয়ে চাঁদ ধরার দুরাশা তার নেই।

বন্ধুর বোন হিসেবে প্রথম প্রথম বীণার সংগে সে মিশেছিল। কথা বলেছিল। বীণার সঙ্গে কদিন বেড়াতেও বেরিয়েছিল। কিন্তু তাতে ক্ষতিই হয়েছে তার। মনের অশান্তি বেড়েছে। খরচা হয়েছে অনেক। অর্থের প্রয়োজন রয়েছে তার প্রচুর।

বীণার অনেক বন্ধু আছে। তারা সকলেই ধনী। বীণার সঙ্গ

পাওয়ার জন্য তারা অনেকেই ব্যাকুল। কিন্তু সে গরীব। তার দূরে সরে থাকাই ভালো।

বীণা কাউকে ভালবাসে না। হয়তো সে ভালবাসাতে জানে না। যৌবনের প্রেরণায় পুরুষ সঙ্গটাই হয়তো সে চায় বেশি। প্রোগ্রাম করে বেড়ালে তার চলবে না সকাল সন্ধ্যায় তার টিউশ্যনি আছে। পাশ তাকে করতেই হবে।

সে সুন্দর, তাকে বীণার ভালো লাগতে পারে। আর পাঁচটি ছেলের মতো অনর্গল বীণার রূপের প্রশংসা সে করতে পারবে না। বীণার মন জয় করবার তার কোনো ইচ্ছে নেই।

বীণাকে তার একদিন ভালো লেগেছিল সত্যি। ভুল বুঝেছিল সে বীণাকে। শুধু রক্ত মাংসের মানুষ বীণা নয়। রূপ আছে যেমন রূপের আগুনে সে পুড়তেও চায় তেমন। একা সে নিজেকে ক্ষয় করতে রাজী নয়, সংগে সে আর সকলকে ক্ষয় করতে চায়।

বীণা গাইতে পারে। নাচতে পারে। তার অন্য বন্ধুরা তাকে বাহবা দেবে। প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠবে। তালে তালে তাল মিশিয়ে তারা মেতে উঠবে তার সংগে, কিন্তু সেই মোহের অনলে নিজেকে ক্ষয় করতে সে ইচ্ছুক নয়।

তার সামনে রয়েছে ভবিষ্যৎ, আশা আকাঙ্ক্ষা, সে প্রফেসর হবে। শত বাধা বিপত্তি সে অতিক্রম করে এসেছে। শেষ সময় সে তার স্বপ্নকে নষ্ট হতে দেবেনা। সে মানুষ হবে। মাথা তুলে দাঁড়াবে সে দশের সামনে।

বীণার আকর্ষণ আছে, চুম্বকের মতো। তাকে টেনেছিল কাছে। মনের দৃঢ়তা নিয়ে সে সরে এসেছে দূরে। বিশ্বময়কে বুঝতে দেয়নি, কিন্তু কি ভাববে বিশ্বময়। বিশ্বাস করে সে তাকে তার বাড়িতে নিয়ে গেছে সবার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছে।

মাসিমা তাকে কত ভালবাসেন। তারাই বা কি ভাববেন

তখন। অবস্থার কত তফাৎ তার সঙ্গে। এক সময় হয়তো সেও ধনী ছিল। এখন তো নয়, সেই পুরানো ইতিহাসকে তাঁরা বিশ্বাসই বা করবেন কেন?

শান্তনুর না যাওয়াটা বিশ্বময়ের কাছে সন্দেহের মতো ঠেকে। শান্তনু কিছু না বললেও সে তো জেনেছে তার কিছু গোপন কথা। শুধু সে জানে না। বাড়ির সবাই জানে। রঘুর মুখে শুনেছে তারা পরের ঘটনার অনেকটাই জানে বিশ্বময়। বাড়িতে সে মা'কে বলেছেও।

কথায় কথায় বিশ্বময় বললো সে কথা। আমাদের বাড়িতে যাওয়া কমিয়ে দিলি কেন? কেউ কিছু বলেছে নাকি?

—না না এমনিই যাচ্ছি কম, আর তো মাসখানেক বাদে পরীক্ষা, পাশ তো করতে হবে।

—একটা কিছু গোপন করছিস বলে মনে হচ্ছে। বীণা কিছু বলেনি তো?

—না, না, বীণা আবার কি বলবে আমায়, বীণার সংগে কতটুকুই বা আমার আলাপ।

—মা তোর কথা খুব বলেন। তোকে মা ভালবাসেন।

—মাসিমাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করি আমি।

—বীণাও বোধ হয় তোকে ভালবাসে।

—ওটা তোর ভুল ধারণা, বীণা কাউকে ভালবাসে না, কাউকেই সে ভালবাসতে পারে না।

—হবে হয়তো।

—আমি একটি মেয়েকে ভালবেসে ফেলেছি। ভয়ে বলিনি তোকে এতদিন।

—আচ্ছা। মেয়েটি কে? দেখেছি কি আমি?

—হ্যাঁ, তোকে সেদিন একটা মিথ্যে কথা বলেছিলাম, ও আমার ছাত্রী নয়, আমার লাভার।

সেদিন বিকেলে বোধ হয় শান্তনুর মেসে। সুমিতা তখন ঘরের মধ্যে ছিল, বসে দুজনে গল্প করছিল। বিছানার ওপর শুয়েছিল শান্তনু। পাশে বসে সুমিতা একটা হাত তার বুকের ওপর রেখেছিল।

দরজাটা ভেজানো ছিল। দরজাটা নড়তেই গায়ের ওপর থেকে হাতটা তুলে নিয়েছিল সুমিতা।

বিশ্বময় ঘরে ঢুকলে চটপট উঠে বসে শান্তনু।

—বস্, বস্।

শান্তনুর ঘরে মেয়ে দেখবে কল্পনা করতে পারেনি বিশ্বময়। তার মনের ভাব বুঝতে পেরে শান্তনু আগেই বলে ফেলে—আমার ছাত্রী।

সুমিতা চালাক মেয়ে। বুঝতে পারে শান্তনু তাদের সম্পর্কটা গোপন করবার চেষ্টা করছে, কোনো কথা না বলে চুপ করে থাকে।

সুমিতাকে লক্ষ্য করে শান্তনু আবার বলে,

—আমার বন্ধু বিশ্বময়। আমরা একসঙ্গে বি. এ. পাশ করেছি, ও এখন 'ল' পড়ছে, এবার পরীক্ষা দেবে।

যাক্, এতদিনে সত্যি কথাটা বলতে পেরে শান্তনু মুক্ত হলো অনেকটা। বীণার আকর্ষণ থেকে নিজেকে দূরে রাখার জন্যই সে যাওয়া বন্ধ করেছে তাদের বাড়ি। বিশ্বময়কে সে ভালবাসে, বিশ্বাস করে। বিশ্বময়ের দ্বারা তার কোন ক্ষতি হবে না কোনদিন। বিশ্বময়ও ভালবাসে ভাইএর মতো সেও জ্ঞানত তার ক্ষতি করার কথা ভাবতেও পারে না।

শান্তনুর কথার কোনো প্রতিবাদ করেনি বিশ্বময়। বোনকে সেও বিশ্বাস করতে পারে না। অনেক ছেলের সংগেই তো সে মেশে। ফোনের পর ফোন আসে, ফোন ধরলেই বীণাকে ডেকে দেবার অনুরোধ আসে।

শান্তনু তবু তো যেচে কোন উপদেশ দিতে আসে নি। তার অন্যান্য বন্ধুরা তার সামনেই বোনের সমালোচনা করেছে। তাদের মধ্যে অনেকেই বীণাকে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন পরিবেশে দেখেছে।

একদিন এক বন্ধুর পার্টিতে তার নিমন্ত্রণ ছিল, বীণারও ছিল। সে সঙ্গে যেতে পারেনি বীণা একাই গিয়েছিল। বিশ্বময়ের বন্ধুতো অবাক। তার অনেক বন্ধুই বীণাকে চেনে। শুধু বিশ্বময়ের বোন বলে নয়। তারা চেনে বীণা তাদের একজন বান্ধবী বলে। তাদের মধ্যে দু'একজনের সংগে তো বীণার খুব বন্ধুত্ব।

বিশেষ কয়েকজনের জন্য বিলেতী জলের ব্যবস্থা করা হয়েছিল, তাদের সংগে বীণাও সেই জল পান করছে সমানে।

এ সব দেখে বিশ্বময় একবার ঢুকে বেরিয়ে এসেছে তৎক্ষণাৎ। তার কলেজের কজন বন্ধু ছিল সংগে। একটু জল পান করবার ইচ্ছে ছিল। মাত্রা রেখে কয়েক পেগ খায় বিশ্বময়।

বীণা একটি ছেলের কাঁধে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে; হাতে রয়েছে মদের গ্লাস। ছেলেটিকে সে চেনে না। ছেলেটি একটা হাত নিয়ে বীণার কটিদেশ আবেষ্টন করে আছে। বীণার আঁচলটা লুটোচ্ছে নীচে। সে বীণার ভাই, বীণার দাদা, বিশ্বময়ের পক্ষে এ দৃশ্য দেখা কিছুতেই সম্ভব নয়।

বিশ্বময় চলে এল, বীণা আর তার বন্ধু ছিল অনেকক্ষণ। তখন সবে তো রাত সুরু। সাতটা মাত্র বাজে। একটা কেবিনে গিয়ে বসেছিল তারা। একটা লম্বা সোফা আর খাবার রাখার জন্য একটা টেবিল আছে কেবিনে। মোটা তাঁতের পর্দাটা সম্পূর্ণ টেনে দেয় সুখেন্দু।

বাবার রঙ এর বিরাট কারবার। কোলকাতার ওপর কয়েকখানা বাড়ি। নাহা পেইন্টিংএর নাম অনেকেই জানে। সুখেন্দুর বোন

মানসীর সংগে আলাপ ছিল বীণার। সেই সূত্রে মানসীর দাদার সঙ্গে আলাপ হয় বীণার।

গ্লাসে ছু'পেগ ব্ল্যাক নাইট ঢেলে বেয়ারা বেরিয়ে যায়। সোডা মিশিয়ে গ্লাসটা পূর্ণ করে নেয় সুখেন্দু। সোফায় হেলান দিয়ে বসেছিল বীণা। একটু আগে ঢুকছে তারা এই বারে, থাকবে অনেকক্ষণ।

একটু আগে মাত্র এক গ্লাস বিয়ার খেয়েছিল বীণা। সুখেন্দুর দিকে তাকিয়ে একটু হাসলো বীণা।

—ক্রেডিট দেখাতে গিয়ে কাবু হয়ে পড়না যেন।

—মাত্রতো ছুপেগ, আমি তো আর সব খাচ্ছি না। তোমাকেও একটু খেতে হবে এর থেকে।

—নেশায় ঢুলে পড়লে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে কিন্তু।

—টেবিলের উপর রাখা সিগারেটের প্যাকেটটা নাড়তে থাকে বীণা।

—তুমি পাশে থাকলে সারারাত এভাবে জেগে থাকতে পারি।

বীণার কাঁধে হাত তুলে দেয় সুখেন্দু। কাঁধের অনেকটা জায়গাই শূন্য। পিঠের অনেকটা কাটা। পেটের অনেকটা ফাঁকা, বুকের দিকেও খানিকটা নেমে এসেছে ব্লাউজটা। এদিকে বগল কাটা। নিটোল দেহের সবটুকু যৌবনই যেন প্রকট হয়ে উঠেছে বীণার।

বসার সময় একটু ফাঁকা ছিল ছুজনের মধ্যে। সুখেন্দুর মৃত্ব ব্যবধানটুকু মুছে ফেলে সরে আসে বীণা। বুকের আঁচলটা এতক্ষণ তোলাই ছিল। কাপড়ের ভাঁজে ঢাকা ছিল বীণার বক্ষকলি ছুটি। চোখের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করার মতো নিটোল তার গড়ন।

বীণার কাঁধে সুখেন্দু তার ডান হাতটা রেখেছিল। আঙুলটা নাড়ছিল সে এদিক-ওদিক। কাঁধ থেকে একটু একটু করে আঁচলটা ফেলে দেয় সুখেন্দু। সুখেন্দুর দৃষ্টির সামনে বীণা। যেন তার রূপ যৌবন মেলে ধরেছে।

বাঁহাত দিয়ে মদের গ্লাসটা তুলে বীণার মুখের সামনে ধরে সুখেন্দু মুখটা তার মুখের কাছে এনে বলে, তুমি প্রসাদ করে দাও।

—আমাকে নেশাগ্রস্ত না করে ছাড়বে না দেখছি।

সুখেন্দুর কাঁধে মাথা রাখে বীণা। সুখেন্দুকে তার বেশ ভালই লেগেছে। মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে। ব্যবহারটা খুব রোমান্টিক। বাইরে যতটা সে গম্ভীর, ভেতরে ততটা সে কোমল।

—একটু খেতে হবে, বাকীটা আমিই খাবো। মাথা তুলে গ্লাসে মুখ ঠেকায় বীণা। দু চুমুক খেয়ে মুখ তুলে নেয় সে। এবার আর কাঁধে মাথা রাখতে হলো না বীণাকে। নেশার জন্য নয় অবশ্য। কাঁধের থেকে ডান হাতটা সরিয়ে নিয়েছিল এবং বাঁহাতের উপর ছোট শিশুর মতো বীণার দেহটাকে এলিয়ে দেয় সুখেন্দু। ডান হাতে গ্লাসটা মুখের কাছে এনে দুচুমুক খেয়ে ফেললো একসঙ্গে।

—দুষ্টমি কোরো না কিন্তু। এটা কেবিন মনে রেখে যা করবার করবে।

কপট শাসনের সুরে স্মরণ করিয়ে দেয় বীণা সুখেন্দুকে। সুখেন্দুর নেশা লেগেছে, জলের নয়, দেহের।

বীণার দেহেতে একটু মৃদু চাপ দিয়ে ঠোঁটে চুমু খায় সুখেন্দু।

—কিছুই তো করবো না। একটু আদর করবো তোমাকে।

আর একবার চুমু খেল সে বীণাকে।

তাকে চিৎ-করে বুকের মধ্যে টেনে নেওয়ায় বীণাকে শোফার ওপর পা দুটো তুলে দিতে হয়েছিল। ওপাশে হাত রাখার জায়গায় পা দুটো রেখেছিল সে। পা দুটো ওপরে রাখায় ডেক্রোনের শাড়ী নীচে নেমে পড়ে খানিকটা।

সুখেন্দুর ইচ্ছে ছিল অনেক। এই কেবিনে কেউ বিরক্ত করতে আসবে না। বেয়ারার হাতে দুটো টাকা দিয়েই সে ঢুকেছে। এখনও অনেক খাবে সে। সে না ডাকলে বেয়ারা উঁকি দেবে না কেবিনে।

—প্রদীপ দত্ত তোমার খুব প্রিয় বন্ধু তাই না? সুখেন্দুর একটা হাত এসে এক জায়গায় অনেকক্ষণ থেমে থাকে।

বীণা মৃদু হাসতে থাকে। দেহের রন্ধ্রে রন্ধ্রে একটা শিহরণ অনুভব করে। ভালো লাগে। একটা আরক্তিম আভা ফুটে ওঠে মুখে।

—তুমিও তো খুব প্রিয়।

—কেতকীকে তোমার কেমন লাগে?

—আমার মোটেই ভালো লাগে না কেতকীর চেয়ে শুভ্রা অনেক ভালো।

—পুলকেশের সংগে নাকি মেশামেশা দিয়েছ? ও সেদিন বলছিল সেকথা।

—বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে বলে অপমান করিনি। কী অডাসিটি, ওর মত নিয়ে সব কাজ করতে হবে আমায়।

—খুব অন্যায় হয়েছে। তোমাকে বুঝতে ভুল করেছে।

বেশ সমঝদারের মতো কপট গাম্ভীর্যে বললো সুখেন্দু। গ্লাসের জলটুকু শেষ করে ফেলে সে।

—বীয়ারটা এবার খাওয়া যাক্, কি বলো? সংগে সংগে ঘড়িটার দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বীণা বললো।

—বলতে পারো বেয়ারাকে। প্রায় আটটা বাজে। বেয়ারাকে ডাকার আগে বীণা সুখেন্দুর কোল থেকে উঠে বসে। পা ছুটো নামিয়ে নেয় সোফা থেকে।

বোনের প্রতি একটা বিতৃষ্ণার ভাব জমেছে বিশ্বময়ের মনে। ক্লাবের নামে ব্যভিচার সুরু করেছে কজন মিলে। বাবা লাই দিয়ে মাথাটা খেয়েছে ওর।

বীণার কোন দোষই দেখতে পাননা তিনি। মাও হয়েছেন তেমনি।

বাবার মতে মত। মেয়েকে যদিও বা শাসন করতে চান, বাবার জন্য বলতে পারেন না কিছুই। মেয়ের মুখ ভার হলে বাবা খুব চঞ্চল হয়ে পড়েন। বাবার জন্য বিশ্বময়ও কিছু বলতে পারে না বোনকে।

আজকাল তো বোনকে কিছু বলে না সে। আগে বলে উল্টে কথা শুনেছে সে বাবার কাছে। বাবা অসন্তুষ্ট হন। মা তাই তাকে নিষেধ করেছে। বীণাকে কিছু বলার দরকার নেই।

॥ ছয় ॥

বীণা উচ্ছৃঙ্খল হলেও, শান্তনুকে সে ভালবেসেছিল। শান্তনুকে আপন করে কাছে পেতে চেয়েছিল। শান্তনুর ব্যক্তিত্ব আর গাম্ভীর্য শান্তনুর প্রতি তার শ্রদ্ধার মাত্রা বাড়িয়ে তুলেছিল।

শান্তনুর সঙ্গে সে যে ক'দিন বেড়িয়েছে, নিজেকে সংযত রাখবার চেষ্টা করেছে অনেক। কিন্তু তার স্বাভাবিক চপলতা প্রকাশ পেয়েছে কিছুটা। জোর করে মনের চঞ্চলতাকে সে বাঁধতে পারেনি বেশি। অহেতুক বেশি কথা বলে ফেলেছে এক এক সময়।

প্রদীপ দত্তর মুখে শান্তনুর কথা শুনে আঘাত পায় খুব। কথায় কথায় প্রদীপ সেদিন বলে বীণাকে, একটি ছেলের সঙ্গে আলাপ হয়েছে। নাম শান্তনু। এম. এ. পরীক্ষা দেবে এবার। তাদের এক ভাড়াটের ঘরে আসে মাঝে মাঝে। জয়দেববাবুর মেয়ের সংগে খুব ভাব তার।

সুমিতাকে চেনে বীণা। প্রদীপের খোঁজে সে কয়েকদিন গিয়েছিল ও বাড়িতে। সুমিতাকে তখন দেখেছে সে। মেয়েটিকে দেখে খুব নম্র বলেই মনে হয়েছে।

শান্তনুর কথা শোনার জন্য বীণার খুব কৌতুহল দেখে প্রদীপ জিজ্ঞাসা করেছিল।

—তুমি শান্তনুকে চেনো নাকি ?

—খুব ভালো করে চিনি। দাদার বন্ধু। আমাদের বাড়িতে মাঝে মাঝে আসে আমার সঙ্গে আলাপ আছে।

—ক্লাবে তো দেখিনি কোনদিন ?

--ছেলেটি খুব ভালো। হৈচৈ মোটেই পছন্দ করে না। নিজের পড়াশোনা নিয়েই সর্বদা ব্যস্ত।

—সুমিতাকে বোধহয় বিয়ে করবে।

—মিথ্যে কথা। ভুল ধারণা তোমার।

প্রদীপকে মুখের উপর অপমান না করলেও কথাটা তার মনে খুব লেগেছিল। শান্তনুকে সে অর্থের মাপকাঠিতে বিচার করেনি। শান্তনুর অতীত কথা শুনে তার প্রতি সহানুভূতি জেগেছিল বীণার মনে।

· শান্তনুকে তার প্রথম থেকেই ভালো লেগেছিল। গায়ে পড়ে সে কথা বলেছে, গল্প করেছে, আসার জন্য বার বার অনুরোধ করেছে। কিন্তু ...

বাবার যা অর্থ আছে, তার জন্য ষ্ট্যাণ্ডার্ড রাখতে ধনীর দুলাল স্বামী তার প্রয়োজন নেই। বাবা তার বিয়েতে খরচ করবে প্রচুর, একটা বাড়ী দেবে যৌতুক স্বরূপ। শান্তনুকে বিয়ে করলে কেউ আপত্তি করবে না। বাবা শান্তনুকে খুব পছন্দ করেন। মা তো তাকে যথেষ্ট ভালবাসেন, দাদা তাকে ভালবাসে ভাই এর মতো।

শান্তনুর চোখে সে একটি কাল্পনিক মনের ছবি দেখেছে। শান্তনু হালকা নয়। তার মনের গভীরে স্থান করে নিতে পারলে সুখী হবে সে খুব। নারীর প্রতি তার মোহ নেই। আছে শ্রদ্ধা, আছে প্রেম, সে তার স্ত্রীকে খুব ভালবাসবে। তার মনের রাণী করে নেবে।

রাতে ফিরে দাদার কাছে যেতে ভরসা পায়নি বীণা। হয়তো

শরীর টলবে, নতুবা হয়তো পা কাঁপবে, গন্ধও পেতে পারে। দাদা তার কোনো কথাই তখন শুনবে না, রাগ করবে, ধমকাবে, তার এই মাতামাতি দাদা একটুও পছন্দ করে না।

বাড়িতে দাদাকে এড়িয়ে চললেও বীণা বাইরের পাচজনের কাছে দাদার খুব প্রশংসা করে। দাদার কথা গর্বের সঙ্গে বলে। বাজে সময় নষ্ট করে না একদম। কথা খুব কম বলে। বাবার সংগে বেরিয়ে এখন থেকেই ব্যবসা পত্র বুঝে নিচ্ছে।

পরদিন সকালে উঠে দাদার কাছে এসেছে বীণা, আস্তে আস্তে দাদার পাশে এসে দাঁড়িয়ে খুব শান্ত এবং নম্রভাবে বললো বীণা,

—শান্তনুদার মেসের ঠিকানা জানো ?

—কেন, ওকে এখন বিরক্ত করবার কি দরকার ? ক-দিন বাদেই বেচারার পরীক্ষা সুরু হবে।

—তার পড়ার ডিষ্টার্ব করবো না আমি, তার কাছে আমি যাচ্ছি না। একটা চিঠি দেব।

—চিঠিটা পরীক্ষার পর দিলে ভাল হয় না ?

— না দাদা, বিশেষ জরুরী। আমাদের বাড়ীতেও তো আসেনি অনেকদিন।

বীণার বলার পর খেয়াল হয়েছে বিশ্বময়ের, সত্যিই তো তাদের বাড়িতে শান্তনু আসেনি অনেকদিন। আজকাল আসা খুব কমিয়ে দিয়েছে। আগে কত ঘন ঘন আসতো গল্প করত অনেকক্ষণ ধরে।

দাদার কাছ থেকে ঠিকানাটা পেয়ে নিজের ঘরে এসে চিঠি লিখতে বসে যায় বীণা। মনের আবেগে কলম ছুটতে থাকে তার।

প্রিয় শান্তনুদা,

প্রথমেই আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম গ্রহণ করিবেন। আপনাকে আমি আমার অন্তরে সম্রাটের স্থান দিয়েছি। আপনাকে আমি ভালবাসি। মনের বীণা এভাবে ভেঙে দেবেন না যেন, সে স্তব্ধ হয়ে যাবে। মুষড়ে পড়বে।

আমার বাইরের রূপটাই কি আপনার কাছে বেশি প্রকট হয়ে উঠলো? আপনার সজীব মনে আমার অন্তরের ভাষা কি ধরা পড়েনি? আমার মুখের পানে তো অনেকবারই তাকিয়েছিলেন, সে কি শুধু নেহাতই একটি মেয়ের মুখ দেখার অভিপ্রায়ে?

আমি হয়তো অনেক ছেলের সংগে মেলামেশা করি। ভালো লাগে তাই। আমি ওদের কাউকেই ভালবাসি না। জীবনের সাথে এদের কাউকেই জড়ানো যায় না। এদের মনের স্থিরতা নেই। ওরাও কাউকে ভালবাসতে জানে না। ভ্রমরের মতো শুধু গুঞ্জনে এরা তৃপ্তি পায়।

আমাদের বাড়ীতে আজকাল আসা ছেড়ে দিয়েছেন। খুব কম আসেন। এমন সময় আসেন যখন আমার বাড়ীতে থাকার কথা নয়। দাদার সংগে দেখা করেন। মা'র সংগে কথা বলে চলে যান। আমাকে এভাবে এড়িয়ে চলা কেন? আমি তো আপনার ক্ষতি করতে চাইনি। আপনার জীবনকে পূর্ণ করতে আমি চেয়েছি। আপনার মনের গভীরে স্থান পেলে ধন্য হবো ভেবেছি।

আপনাকে বিশ্বাস করা যায়। এখন যৌবন আছে সোহাগ করার লোক হবে অনেক। তার ওপর ধনীর দুলালী। আমার দাম হয়তো অনেক। কিন্তু নারীর এই দেহের সৌন্দর্য তো বেশিদিন থাকার নয়, রূপ পড়ে গেলেই তখন এ দেহের আকর্ষণের এক কাণাকড়িও দাম থাকবেনা। আজ যারা আমার রূপের মোহে আমার পাশে পাশে ঘুরছে, তখন তাদের কেউই আমাকে আর সোহাগ করবে না।

অর্থ মানুষকে শান্তি দিতে পারে না। অর্থ দিয়ে ভালবাসা কেনা যায় না। আমি আপনাকে ভালবাসি। আপনাকে কোনদিন ছোটো করিনি। এবং ছোট করবো বলেও ভাবিনি কোনদিন। আপনার সামনে আমি নম্র থাকার চেষ্টা করেছি। হয়তো আমার চপলতা বা চঞ্চলতা প্রকাশ পেয়েছে মাঝে মাঝে। সেটা আপনি ক্ষমা করে নেবেন ভেবেছিলাম।

আপনার পরীক্ষা বলে এখন আর গেলাম না। হয়তো পড়ার ক্ষতি হবে। আর তো মাত্র ক'দিন বাকী। এখন এক একটি মুহূর্তের মূল্য অনেক আপনার কাছে। চিঠিটা অযথা বড় হয়ে গেল। আপনার মতো তো গুরু গম্ভীর নই। উচ্ছ্বাস আর আবেগের আগুনে সংযম পুড়ে গেছে।

প্রদীপ দত্তকে হয়তো চেনেন আপনি। সুমিতাদের বাড়িওয়ালা। সুমিতার ভালোর জন্যই বলছি সুমিতাকে সাবধান করে দেবেন, সে যেন প্রদীপ দত্তর প্রলোভনে পা না দেয়। আগুন নিয়ে সুমিতা খেলতে পারবে না আমার মতো। পুড়ে মরবে শেষ পর্যন্ত।

যাক্ অনেক কথা বললাম। আপনার উত্তরের আশায় রইলাম। আমার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করবেন। ইতি --

বীণা

এই চিঠি নিয়ে সকালটা কেটে গেল তার। কলেজ যাবার পথে লেটার বক্সে ফেলে দেয় খামটা। তার এই চিঠি পেয়ে নিশ্চয়ই শান্তনু তার মত বদলাবে। সুমিতাকে সরে যেতে হবে। বীণার পাশে সুমিতা বেমানান। আত্মগর্বে বীণা তার মনের ক্ষোভ সমস্ত ভুলে যায়।

পরীক্ষার পর আরও এক সপ্তাহ পেরিয়ে গেল। বীণার চিঠির কোনো উত্তর এলো না। এর মধ্যে দাদা একদিন মা'র কাছে শান্তনুর প্রশংসা করছিল। পরীক্ষা খুব ভালো দিয়েছে। হিষ্ট্রীতে সে

ফার্স্ট ক্লাস পাবেই। প্রচুর পড়াশোনা করেছে। বইএর পাহাড় হয়ে গিয়েছিল তার পড়ার টেবিলে।

শান্তনু তার চিঠির কোনো কথাই তার দাদাকে বলেনি। বললে দাদা তার কাছে গোপন করতো না। শান্তনুর মনের ভাবটা নিশ্চয়ই তার কাছে প্রকাশ করতো। তাকে পছন্দ না করলেও, সে তো তার বোন। তার ভালো-মন্দর দিকে নিশ্চয়ই তার দৃষ্টি থাকবে।

আশায় আশায় আরও কটা দিন কাটালো বীণার। কিন্তু কোন উত্তর এলো না। শান্তনু ফোন করে বীণার মাকে তার পরীক্ষার খবরটা দিয়েছে। আসতে না পারার জন্য খুব দুঃখিত সে।

কলেজ থেকে বাড়ী ফেরার পথে শান্তনুর মেসে এসে হাজির হলো বীণা। 'ন' নম্বর রুম। সিড়ি ভেঙে তিন তলায় উঠে দেখে দরজায় তালা মারা। তখন তিনটের মতো বাজবে.

পরদিন আর আসতে পারেনি বীণা। দু'দিন বাদে আবার এলো সে মেসে। তিনটে না করে একটু আগেই এলো সে। দরজায় তালা নেই দেখে ধড়ে প্রাণ এলো তার। ব্যর্থ হয়ে ফিরে যেতে হবে না তাকে।

দরজাটা ভেজানো রয়েছে। দরজাটার কাছ পর্যন্ত আসতেই ভেতরের অস্পষ্ট কথা তার কানে গেল নারীর কণ্ঠও শুনতে পেল সে। একটা হাসির হিল্লোল উঠলো ঘরের মধ্যে।

দরজার সামনে সে দাঁড়ালো কয়েক মিনিট। কোনো সাড়া না দিয়ে দরজাটা খোলা হয়তো তার উচিৎ হবে না। কড়াটা নাড়লো সে আস্তে করে।

— কে?

ঘরের ভেতর থেকে প্রশ্ন করে শান্তনু। সে শুয়েছিল বিছানার উপর। স্মিতা তার বুকের ওপর ঝুকেছিল। একটা হাত সে রেখেছিল শান্তনুর কপালে।

সুমিতা পাশে সরে বসলো। শান্তনু উঠে বসলো বিছানার ওপর। বিশ্বময় এসেছে নিশ্চয়ই। সেইতো এই সময় আসে মেসে।

—আমি বীণা।

নারীকণ্ঠ ভেসে এলো দরজার ওপাশ থেকে।

—ভেতরে এসো।

বললো শান্তনু।

শান্তনুর আহ্বানে দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলো বীণা। সুমিতাকে দেখেই চিনতে পারে সে। প্রদীপ দত্তর বাড়ীতে আলাপও হয়েছিল।

—আমার এখানে হঠাৎ কি মনে করে?

শান্তনু এমন ভাবে বললো কথাটা যেন, সে কোনো চিঠি পায়নি বীণার। বীণাকে সে যেন চেনে মাত্র। কোনো সম্পর্ক নেই যেন তার সঙ্গে। তবু রক্ষে না চেনার ভান করেনি। ব্যস্ততার ভাব দেখিয়ে তাকে চলে যাবার ইঙ্গিতও দেয়নি। টেবিলের নীচে থেকে খালি চেয়ারটা টেনে বার করে তার ওপর বসলো বীণা।

—চিনতে পারছেন আমাকে?

সহজ ও স্বাভাবিক কণ্ঠে বললো সুমিতা।

—হ্যাঁ।

এক পলক তাকিয়ে চাপা কণ্ঠে বললো বীণা। সুমিতাকে দেখার পর থেকে তার শিরায় শিরায় রক্ত যেন চঞ্চল হয়ে উঠেছে। মনে মনে অনেক কথার জল্পনা করেছিল, কিন্তু কথার খেই হবিয়ে ফেলে বীণা। কি বলবে সে ভেবে পায় না।

—তোমাদের বাড়ীতে যাওয়া হয়নি ক'দিন। মাসিমা কেমন আছেন? ভাবাবেগহীন কণ্ঠে বললো শান্তনু।

—মা ভালই আছেন। আপনার কথা বলেন মাঝে মাঝে। বীণা আর এভাবে নীরবে বসতে পারছিল না, তার আশার সৌধ ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। শান্তনু সত্যিই সত্যি সুমিতাকে ভালবাসে এ

ভালবাসায় ঘুণ ধরাতে না পারলে তার স্থান নেই এখানে। মাথার মধ্যে দুষ্টু বুদ্ধি চাড়া দিয়ে ওঠে। শান্তনুকে সে শান্তিতে থাকতে দেবে না। তাকে অবজ্ঞা করার প্রতিফল তাকে হাড়ে হাড়ে অনুভব করতে হবে।

—আপনি আসুন না একদিন আমাদের বাড়িতে। অনেকটা অনুরোধের সুরে বললো বীণা।

—যাবো, বিশ্বময়ের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তাকেও বলেছি।

—কবে যাবেন ?

—এ সপ্তাহেই। সকালের দিকেই যাবো।

—খুব ভালো হয় তাহলে। দাদাও থাকবে। আমিও থাকবো। মা তো তখন থাকবেই। বীণা আর না বসে উঠে দাঁড়ায়।

—চলি আজ।

শান্তনুর দিকে শেষ বারের মতো একবার তাকিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় বীণা। সুমিতার দিকে ফিরেও তাকালো না একবার।

—কে এই মেয়েটি ? প্রদীপবাবুর কাছে যায় মাঝে মাঝে।

সুমিতা বীণার গমন পথে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল। তারপর মুখ ফিরিয়ে শান্তিনুকে বললো।

—বিশ্বময়ের বোন। হয়তো কোনো কথা বলতে এসেছিল আমাকে।

—মেয়েটি খুব সুবিধের নয়। ওর সংগে না মেশাই ভালো।

—কে আর মিশতে যাচ্ছে। ওর কথা থাক।

বীণার প্রসঙ্গ এখানেই শেষ করলো শান্তনু। বীণা যে আসবে এটা সে ভেবে রেখেছিল। সুমিতা থাকায় ভালই হয়েছে। মুখের ওপর তাকে রুক্ষ কথা বলতে হয়নি। বীণা আজ তার চিঠির উত্তর নিজেই পেয়ে গেছে। শান্তনুকে বলার মত আর কিছুই নেই তার।

॥ সাত ॥

প্রদীপ দত্তর যত রাগ এসে পড়লো শান্তনুর ওপর। সুমিতাকে হাত করেছে। সে আজকাল আর তার সংগে কথা বলে না তেমন। সুমিতা আগে তার সংগে কত কথা বলেছে। এখন এড়িয়ে চলে।

সুমিতাকে সে বিয়ে করতে চেয়েছিল, সুমিতার মত না পেলেও সুমিতার মার মত সে পেয়েছিল। মাসিমার সংগে তার ভাব খুব। অনেকদিন অনেক গল্প করেছে এক সংগে। তাকে মাসিমা বলেছিলেন।

—তুমি সুমিতাকে বিয়ে করবে, আমার আপত্তি হবে কেন? তোমার মত সুপাত্র পাওয়াতো ভাগ্যের কথা। পড়াটা শেষ হলেই একটা শুভদিন দেখে তোমার হাতে তুলে দেব সুমিকে। ঘরের মেয়ে আমাদের ঘরেই থাকবে।

—আমি আপনাদের সংগে কোনদিন খারাপ ব্যবহার করিনি। আমি ঘরের ছেলের মতই মিশেছি আপনাদের সঙ্গে।

খুব নম্র গদ গদ গলায় বলেছিল প্রদীপ।

অনেকদিন আগেকার কথা এসব। প্রদীপ নিশ্চিন্তই ছিল। সুমিতা একদিন তার ঘরেই আসবে। তার ঘর আলো করবে। চিঠিতে সে মাকেও জানিয়েছে, মা দেখেছেন সুমিতাকে।

সুমিতাকে কারো অপছন্দ হবে না। খুব সুন্দর দেখতে সে। তার ওপর মিষ্টি ব্যবহার সুমিতার।

শান্তনুকে নিয়ে সুমিতা তার বাবার সংগে আগ্রা বেড়াতে যাচ্ছে এ খবরটা কানে যেতেই প্রদীপ পড়লো আকাশ থেকে।

পাশাপাশি থেকেও সে জানতে পারেনি একটুও। গতকাল

জয়দেববাবুর মুখে শুনলো সে খবরটা। তিনি সাদাসিদে লোক। সংসারের জন্য জিনিষপত্তর কিনে বাড়ি ঢুকছিলেন তিনি। মাস কাবার না হতেই হঠাৎ মাসের সওদা করায় জিজ্ঞাসা করে প্রদীপ,

—মাস শেষ না হতেই সওদা করলেন এবার ?

প্রদীপ ঘরে ছিল তখন। দুপুরে বাড়ি ফিরে বেরয়নি আর।

—আগ্রা যাচ্ছি বেড়াতে। তোমার মাসিমা একা থাকছেন। কেনা কাটাটা না করে দিয়ে গেলে অসুবিধে হবে।

—আগ্রা যাচ্ছেন কবে ?

—এই তো সোমবার রাতের গাড়িতে রওনা হবো।

—আপনি একা, না আর কেউ সংগে যাবে ?

—সুমিতা আর শান্তনুও যাচ্ছে। দিন দশেক থাকবার ইচ্ছা আছে। আমার যাওয়ার ইচ্ছা ছিল না। মেয়ে ধরলো।

প্রদীপের সংগে কথা শেষ করে জয়দেববাবু নিজের ঘরের দিকে পা ফেললেন। তিনি তো কিছুই জানেন না। তিনি জানেন সুমিতা শান্তনুকে বিয়ে করবে। শান্তনু প্রফেসারি পেলেই একটা শুভদিন দেখে বিয়ে করবে সুমিতাকে।

সুমিতা কথাটা প্রথম মা'র কাছে পাড়ে।

—মা আমি শান্তনুকে কথা দিয়েছি। শান্তনু আমায় ভালবাসে।

—প্রদীপ যে তোকে বিয়ে করতে চায়। আমাকে সে অনেকদিন বলেছে একথা।

—তা বলুক। বিয়েটা ছেলেখেলা নয়। শান্তনুর মতো ছেলে হয় না। তুমি তো দেখেছ। তোমাদের সে কত শ্রদ্ধা করে।

—তা করে। প্রদীপও পাত্র খারাপ নয়। অবস্থা ভালো।

—তুমি জানো না মা, প্রদীপ একটা খুব বাজে ছেলে। ও মদ খায়। অনেক মেয়ের সঙ্গে মেশে।

মা স্তব্ধ হয়ে থাকে মেয়ের কথায়।

—এ সব কথা আমায় আগে বলিস্‌নে কেন? আমি যে ওকে কথা দিয়ে দিয়েছি।

—বিয়ের কথা তো ওঠেনি আগে। আমি তো ওর সংগে ভালো করে কথাও বলিনি। ওর মত একটা দুশ্চরিত্র লোক হয় না।

—ওকে আমি এখন কি বলি?

—বলবে আমার কথা। আমার পছন্দ নয়। আর ওকে আমার বিয়ে করার ইচ্ছেও নেই। শান্তনুকে জয়দেববাবুর খুব পছন্দ। শান্তনুর কথা বলায় তিনি এক কথায় রাজী হয়েছেন। মেয়ের কথায় ঠিক নয়, শান্তনুর কথায় তিনি আগ্রা যেতে স্বীকার হয়েছেন। অনেক গুলো টাকা খরচা হয়ে যাবে।

প্রথমে শান্তনুর মাথায় আসে এই প্রোগ্রামটা। পরীক্ষার পর কোথাও বেড়াতে যাবার ইচ্ছা তার ছিল। একদিন বেড়াতে বেরিয়ে কথায় কথায় আগ্রার তাজমহলের কথা ওঠে দু'জনের মধ্যে। কেউই দেখেনি তাজমহল। কিন্তু সৌন্দর্যের খ্যাতি তারা শুনেছে খুব।

—আগ্রা বেড়াতে গেলে মন্দ হয় না। কথাটা নিজের মনেই বলে শান্তনু।

—ভালই হয়।

মনের উচ্ছ্বাসে উত্তর দেয় সুমিতা,

—বাবাকে রাজী করাতে পারলে যাওয়া যেত এক সংগে।

—ইচ্ছা কি আমারও কম! বাবাকে আমি রাজী করাবই। তুমিও বাবাকে বলবে এক সময়।

—আমার বলাটা কি ভালো দেখাবে?

—খারাপের কি আছে? দুদিন বাদে যার হাতে তাঁরা মেয়েকে সম্প্রদান করবেন, তার সঙ্গে বেড়াতে বেরোলে আপত্তি হবে কেন? আমি তো অন্য ছেলের সঙ্গে যেতে চাইছি না।

—তোমার বাবার যদি ইচ্ছে থাকে, তবেই আমি এই প্রস্তাবটা করবো তাঁকে।

—বেশ তো কথাটা বলে দেখি, বাবা কি বলেন। কথাটা সেদিনকার মতো এখানে ইতি পড়লেও জল্পনা কল্পনা হয়েছে অনেক দিন। বাবা বুড়ো মানুষ। তাদের মতো সব সময় ঘুরতে বেরোবে না। তিনি হোটেলেই থাকবেন। তার একসঙ্গে ঘুরতে পারবে খুব।

বাবার কাছে কথাটা পাড়ে সুমিতা।

—যাবার তো ইচ্ছা ছিল, কিন্তু হল আর কৈ।

জয়দেববাবুর কণ্ঠে নৈরাশ্যের সুর ধ্বনিত হয়।

—চলো না বাবা, শান্তনুদা বলছিল খুব আবদারের সুরে বলে সুমিতা।

দু'একদিন বাদে শান্তনুও এসে অনুরোধ করে জয়দেববাবুকে। মেয়ের আবদারকেও উপেক্ষা করতে পারেন না তিনি। শেষে অবশ্য রাজী হন তিনি।

সোমবার সত্যি সত্যি রাত্তের ট্রেনে তারা তিনজন রওনা হলো। দূর দেশ ভ্রমণ সুমিতার জীবনে এই প্রথম। দূরে কোথাও যায়নি সে এর আগে। কলকাতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকেছে বেশীর ভাগ সময়।

শান্তনুর জীবনেও তাই। বাংলার বাইরে সে বেরয়নি কোনদিন। নতুন স্থান দেখবার আনন্দ তো রয়েছেই, তার ওপর একটা বিশ্ব-বিখ্যাত শিল্পকলা দেখতে চলেছে। অনেকের এ দেখার সুযোগ হয় না। সেদিক দিয়ে সে ভাগ্যবান অনেকের চেয়ে।

এই সাতদিন সুমিতা তার পাশে থাকবে সর্বক্ষণ। জয়দেববাবু নিরীহ লোক। তিনি তাঁর পড়াশোনা নিয়েই ব্যস্ত থাকবেন। বই পত্তর তো কম নেননি সংগে করে। একটা সুটকেশ ভরে শুধু

বই নিয়েছেন। এই সাতদিন ফাঁকা পাবেন নিজেকে। কোন তাড়া থাকবে না কাজের। অফুরন্ত সময় তাঁর।

সুমিতাকে নিয়ে সে বেড়াবে সব সময়। বেড়ানো ছাড়া আর তো কোনো কাজ নেই তাদের। তাজমহলের সৌন্দর্য উপভোগ করবে। বিশ্বময়ের ক্যামেরাটা সংগে নিয়েছে। সুমিতার কোনো ছবি নিজের হাতে তোলেনি শান্তনু।

ট্রেণ ছাড়ার খানিকক্ষণ বাদেই জয়দেববাবু ঘুমিয়ে পড়েন। মুখোমুখি বসে শান্তনু আর সুমিতা কথা বলে চলে। বাইরে অন্ধকার রাত। ঝোপেঝাড়ে জোনাকীরা মিট্‌মিট্‌ জ্বলছে। এক একটা গাছ অন্ধকারে দৈত্যের মতো দাঁড়িয়ে আছে বলে মনে হচ্ছে।

আগ্রায় পৌঁছে তাজমহল হোটেলে এসে ওঠে তারা। অল্পের মধ্যে এই হোটেলটাই ভালো। সুব্যবস্থা আছে, চার্জও কম। মধ্যবিত্ত অনেকেই প্রায় এই হোটেলে এসে প্রথম ওঠে। কলকাতা থেকেই তারা নামটা জেনে নিয়েছিল।

শান্তনু অনেকদিন থেকেই ভেবে রেখেছিল পরীক্ষার পর সে আগ্রায় বেড়াতে যাবে। নিজের আয়ের থেকে প্রতিমাসে বাঁচিয়ে কিছু টাকা সে জমিয়েছিল। ইতিহাসের ছাত্র হয়ে ঐতিহাসিক কোনো জিনিসই সে দেখেনি।

প্রদীপ খুব চিন্তিত হয়ে পড়ে। শান্তনুর যাওয়া আসাকে তেমন সে গুরুত্ব দেয়নি। কি আছে শান্তনুর। শুধু ক'টা সার্টিফিকেট থাকলেই চলে না আজকাল। শান্তনু গরীব। কেউ নেই তার। আর সে অবস্থাপন্ন। বাড়ি আছে। নিজের ব্যবসা আছে। ব্যাঙ্কে ব্যালেন্সও আছে।

তার ধারণা ভেঙে যায়। তার সামনে থেকে শান্তনু সুমিতাকে

ছিনিয়ে নিয়ে যাবে, এ কথা সে কল্পনাও করতে পারে না। জয়দেব বাবুর মুখে এ খবর শোনার পর থেকে নানা রকম ফন্দি আঁটতে থাকে প্রদীপ।

বীণা রায়ও শান্তনুর ওপর খুব রেগে গেছে। শান্তনুর কথা তুললে ও প্রসঙ্গ সে এড়িয়ে যায়।

মাথায় কোনো নতুন বুদ্ধি আসে না প্রদীপের। এই সাতদিনে শান্তনু সুমিতাকে আরও হাত করে ফেলবে হয়তো।

সুমিতাকে তার চাই। এই চার বছর সে সুমিতাকে দেখে আসছে আগে একটু রোগা ছিল। এখন তার চেহারা খুব ভালো হয়েছে। শান্তনুর কাছে সে পরাজয় স্বীকার করতে রাজী নয়। জীবনে কারো কাছে সে নতি স্বীকার করেনি। এখনও করবে না।

কাউকে কিছু না বলে সেও আগ্রায় রওনা হয়। তাজমহল হোটেলেই এসে ওঠে। তিনতলায় একটা ফ্ল্যাট ভাড়া নেয়। বিশ্রাম করে খাওয়া দাওয়ার পাট চুকিয়ে বিকেলে আগ্রা ফোর্টে বেড়াতে আসে প্রদীপ। দূর থেকে সে শান্তনু আর সুমিতাকে দেখতে পেয়ে অন্যমনস্কভাবে সেদিকে হাঁটতে থাকে। আকস্মিকভাবে যেন দেখা হয়ে যাবে তার সংগে। জয়দেববাবু ছিলেন না। শান্তনু আর সুমিতা কথার মধ্যে ডুবেছিল। হাটতে হাঁটতে প্রদীপ তাদের সামনে এসে হাজির হয়।

—আরে সুমিতা যে। কি খবর ? তোমরা এখানে কতক্ষণ ?

—আপনি এখানে ! সুমিতা অবাক হয়ে যায়।

—দিল্লী যাবার পথে নেমে পড়লাম। তোমরা এসেছ। ভাবলাম দেখা করে যাই। তাজমহল হোটেলে উঠেছ তো ?

শান্তনুকে যেন প্রদীপ চেনেই না। তার দিকে না তাকিয়ে সুমিতাকে বললো সে।

শান্তনু হ্যাঁ বলতে যাচ্ছিল। সুমিতার চোখে চোখ পড়তেই সে থেমে যায়। শান্তনুকে বলতে না দিয়ে সে বললো,

—তাজমহলে উঠেছিলাম, এখন আমরা ভারত হোটেলে আছি।

—তোমার বাবাকে দেখছি না, তিনি কোথায়?

—বাবার এক বন্ধু এসেছে, বাবা তাঁরে সঙ্গে বেরিয়েছেন আজ।

—তারপর শান্তনুবাবু, আপনি কবে এলেন? এতক্ষণে প্রদীপ যেন শান্তনুকে দেখতে পেল।

—আমরা তো এক সঙ্গেই এসেছি। শান্তনুদার জন্যেই তো আসা। শান্তনুদা গরজ না করলে, আসা হতো না।

চুপ হয়ে থাকে প্রদীপ। এবারও শান্তনুকে বলতে না দিয়ে তার আগেই বললো সুমিতা।

—চল, ফোর্টটা ঘুরে দেখা যাক। প্রদীপ বললো সুমিতাকে।

—সেই সকালে বেরিয়েছি। খুব টায়ার্ড হয়ে পড়েছি। আজকে আর ঘুরবো না। সন্ধ্যা পর্যন্ত এখানেই বসে থাকবো।

মুখের ওপর 'না' করা যায় না। তাই ঘুরিয়ে না যাওয়ার ইচ্ছেটাই প্রকাশ করলো সুমিতা।

শান্তনু নীরব। কী সুন্দর পাকা অভিনেত্রার মতো অভিনয় করে যাচ্ছে সুমিতা। সহজ সত্যের মধ্যে মিথ্যে কথাগুলো অভিনয় করে যাচ্ছে সে প্রদীপকে। স্থূল বুদ্ধি বলে প্রদীপ বুঝতে পারছেনা, তাকে কী নির্মম ভাবে প্রত্যাখ্যান করছে সুমিতা। হয়তো নেশার ঘোরে বুঝতে পেরেও না বোঝার ভান করছে প্রদীপ।

—আপনি কোথায় উঠেছেন?

বললো শান্তনু। প্রদীপের কথার উত্তরে তার বলা হয় নি কিছু।

—আমি, তাজমহলে উঠেছি। তিন তলার তিন নম্বর ফ্ল্যাটে আছি। আসুন না কাল, সকালটা কাটান যাবে।

—চেষ্টা করবো।

মনের ইচ্ছাটা চেপে রেখে মুখে সম্মতি জানায় শান্তনু।

—তুমিও এস ওনার সংগে।

সুমিতাকে যাবার জন্য নিমন্ত্রণ করে প্রদীপ। লুব্ধ দৃষ্টিতে একবার সে তাকায় সুমিতার দিকে। সুমিতার শরীরটা রিরি করে ওঠে সংগে সংগে। দেহের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যেন এক ঝলক বিদ্যুৎ খেলে যায়। সুমিতাকে চঞ্চল করে তোলে। অসহ্য লাগে প্রদীপের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। ভ্রমরের দংশনের মতো তার শরীরটা জ্বালিয়ে দেয়। স্থির থাকতে পারে না সুমিতা।

কিন্তু প্রদীপকে অপমান করার উপায় নেই তার। প্রদীপ তাদের বাড়ীওয়ালা। মা প্রদীপকে পছন্দ করে খুব। এ বাড়ি ছেড়ে উঠবে না। ভাড়া কম। ঘর দু'খানা ভালো। এত অল্প ভাড়ায় ঘর এই শহরে কোথাও পাওয়া যাবে না। আর বাবাও এবাড়ি ছাড়তে খুব ইচ্ছুক নন

প্রদীপ আর দাঁড়ায় না সুমিতার অস্থিরতা তার চোখেও ধরা পড়ে। প্রদীপ বোকা নয় মোটেই। সে বুদ্ধিমান। সে কূট। এই পরিবেশে, কোলকাতা থেকে এতদূরে তাকে দেখবে ভাবতে পারেনি সুমিতা। নিভৃতে শান্তনুর প্রেমে সাঁতার কাটার জন্যই এসেছে এতদূরে।

শান্তনুর প্রতি তীব্র হিংসায় তার শরীর জ্বলতে থাকে। ক্ষোভ-টাকে সে মনের মধ্যে চেপে রেখে সরল ভাবে হাসবার চেষ্টা করে প্রদীপ। শুকনো হাসি প্রকাশ পেল তার ঠোঁটে।

—চলি, আবার কাল দেখা হচ্ছে তাহলে। পিছন ফিরে প্রদীপ ফোর্টের দিকে পা ফেলে। প্রদীপ অনেকটা এগিয়ে যেতেই খিল খিল করে হেসে উঠলো সুমিতা। হাসতে হাসতে সে শান্তনুর বুকের ওপর ঝুঁকে পড়লো। মাথাটা ঠেকল ক'বার তার বুকে।

—তুমি যে এত ফাইন অভিনয় করতে পারো, জানতাম না আগে। সুমিতার কাঁধে একটা ঝাকুনি দিয়ে বললো শান্তনু।

—চল, ওদিকটায় একটু ঘোরা যাক্। ভীষণ দম বন্ধ হয়ে আসছিল আমার।

সুমিতা একটা হাত ধরলো শান্তনুর।

—প্রদীপবাবু কিন্তু তোমাকে খুব ভালবাসে। বলে হাঁটতে সুরু করে শান্তনু।

—তোমাকে আর ওর হয়ে ওকালতি করতে হবে না।

—বেচারাকে খুব ভোগালে।

—কালকে আর এদিকে বেড়াতে আসবো না। সন্ধ্যার অনেক পরে তারা হোটেলে ফিরে আসে। প্রদীপ দেখে ফেললে আর এক ঝামেলায় পড়তে হবে। কাল দুপুরের পর তাজমহল হোটেলে আর থাকবেনা প্রদীপ। নির্ঘাৎ ভারত হোটেলে গিয়ে উঠবে। তাদের একবার খোঁজ করবেই।

সন্ধ্যা নাগাদ ফিরে আসে প্রদীপ। নিমন্ত্রণ না করে এলে সে এক্ষুনি চলে যেত ভারত হোটেলে। কাল দুপুরটা পর্যন্ত থাকলে হবে না। যে কোনো উপায়ে শান্তনুকে সরাতে হবে সুমিতার কাছ থেকে। প্রদীপ বুদ্ধি আঁটতে থাকে।

রাতে খাওয়া দাওয়ার পর চিঠি লিখতে বসে সে সুমিতার মার কাছে। আগ্রায় আসছে বলেনি, বলেছে দিল্লী যাচ্ছে সে। একটা বিশেষ জরুরী কাজ রয়েছে তার।

শ্রীচরণেষু, মাসিমা—

আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করবেন। দিল্লী যাবার পথে আগ্রায় নেমেছিলাম। জয়দেববাবুর সংগে দেখা হয়নি। সুমিতার সংগে দেখা হয়েছে, শান্তনুও সঙ্গে ছিল।

আমি আপনাকে শ্রদ্ধা করি, মায়ের মতো ভক্তি করি। সুমিতার

ব্যবহারে আমি খুব মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছি। সুমিতা এখন নেশাগ্রস্ত। ভাল মন্দ বুঝবার ক্ষমতা সে হারিয়ে ফেলেছে। আমার মত ছেলেকে সে উপেক্ষা করে আমাকে একরকম অপমানই করেছে। জানি না শান্তনুর প্রতি সুমিতার এই পক্ষপাতিত্ব কেন?

শান্তনু ছেলেটি সুবিধের নয়। নিশ্চয়ই আমার সম্পর্কে সে অনেক মিথ্যে অপবাদ দিয়ে সুমিতার মনটা বিষিয়ে তুলেছে। সুমিতা আগে আমাকে খুব পছন্দ করতো, শান্তনুর সংগে আলাপ হওয়ার পরেই আমাকে এড়িয়ে চলছে সে।

সুমিতা এখনও ছেলেমানুষ। তার মনোভাবকে আমি তেমন কোন গুরুত্ব দিচ্ছি না। নিজেই চেষ্টা করলে শান্তনুকে সে ভুলতে পারবে। আপনি মন ঠিক করে বিয়ের দিন ধার্য করুন, আপনার কথা জয়দেববাবু অমান্য করতে পারবেন না। জয়দেববাবুর মত লোক হয় না। আমি কয়েকদিনের মধ্যে কোলকাতায় ফিরছি। আশা করি ভালো আছেন। এখানকার এরাও সব ভাল আছে।

ইতি—

আপনার প্রদীপ

চিঠি শেষ করে বেয়ারাকে দিয়ে মদ আনায় প্রদীপ। মাথা ঝিমঝিম করছে তার। শান্তনুকে সরাতে না পারা পর্যন্ত তার অস্থিরতা যাবার নয়।

বেয়ারা মদ নিয়ে এলে খেতে শুরু করে প্রদীপ। আজ সারাদিনে এক ফোঁটাও বিলেতি জল পান করেনি। সুমিতা শান্তনুর গা ঘেঁষে বসেছিল। ওই দৃশ্য দেখার পর থেকে তার শরীরের রক্ত চঞ্চল হয়ে উঠে। হাত দুটো তার ভীষণ নিস্‌পিস্‌ করেছিল। অন্ততঃ কিছু কড়া কথা শোনাবার জন্য ঠোঁট দুটো কেঁপেছিল খুব।

॥ আট ॥

আগ্রা থেকে শান্তনু ফিরেছে প্রায় দিন পনেরো হয়ে গেছে। প্রদীপ দত্ত অবশ্য তাদের আগেই ফিরে এসেছিল। শান্তনু সুমিতাকে আগ্রা বেড়াতে নিয়ে গিয়েছিল, এ খবরটা সে বীণাকে দেয়। শান্তনু একা গেছে একথাটা শুধু জানতো বীণা, দাদার মুখে সে শুনেছিল।

শান্তনু কোলকাতায় ফিরে বিশ্বময়ের সংগে দেখা করতে গিয়েছিল তাদের বাড়িতে। একটা কেসের ব্যাপারে অনুসন্ধান করতে বিশ্বময় সকালেই বেরিয়ে গিয়েছিল। একমাত্র বীণা ছিল বাড়িতে।

কোনো রাগ না দেখিয়ে বীণা তার সঙ্গে খুব ভালো ব্যবহার করে। সুমিতাব কথা সে উল্লেখ করে না একটুও। তার সংগে বেড়াতে বেরোবার জন্য অনুরোধ করে শান্তনুকে। প্রথমে একটু আপত্তি করলেও পরে রাজী হয় শান্তনু একদিন সঙ্গে বেরোলে বীণা যদি খুশী হয়, তাতে ক্ষতি কি আছে তার।

সেদিন না বেরিয়ে কয়েকদিন পরে সে বীণার সংগে বেড়াতে বেরিয়েছিল। বন্ধুর মতই ব্যবহার করে বীণা। সারাটা বিকেল ঘোরার পর সন্ধ্যায় এসে তারা একটা রেষ্টুরেণ্টে ওঠে। বেশ বড় সম্ভ্রান্ত রেস্তোরা বেয়ারা থেকে ম্যানেজার প্রত্যেকেই চেনে বীণাকে।

আগ্রা থেকে ফেরার পথে জয়দেববাবু অসুস্থ হয়ে পড়েন। বুড়ো মানুষ, ট্রেনে ভিড় ছিল খুব। সারাটা রাত জেগে থাকতে হয়েছিল। তার ওপর বাইরে খুব বৃষ্টি হওয়ার ঠাণ্ডাও লেগে যায়। হু হু করে ঠাণ্ডা হাওয়া এসে ঢুকেছিল কমারার মধ্যে। জানালা বন্ধ করতে পারেনি, অনেকেই আপত্তি করেছে।

জ্বর হয় জয়দেববাবুর রাত হয়তো তখন সাড়ে দশটা হবে।

শান্তনু নিজের ঘরে বসে আছে। একজন বেয়ারা এসে তার ঘরে ঢোকে।

—বাবু, আপনার ফোন এসেছে।

—ফোন! এত রাতে আবার কে ডাকলো আমাকে। তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে এল শান্তনু।

টেলিফোনটা হাতে নিয়ে ম্যানেজারবাবু এক গাল হেসে বললেন।

—আজ বুঝি সুমিতা দেবীর সঙ্গে দেখা করেন নি?

—কেন বলুন তো?

ফোনটা মুখের কাছে নেবার আগে প্রশ্ন করলো শান্তনু।

—ফোনটা ধরলেই বুঝতে পারবেন। তিনি ডেকেছেন আপনাকে।

ম্যানেজার হরগোপালবাবুর নামটা মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। এর আগেও সুমিতা অনেকবার ফোন করেছে তাকে। হরগোপালবাবু হাসলেন আবার। মোটা গোলগাল এই লোকটি হাসলে বেশ দেখায় কিন্তু।

বাইরে মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে। সন্ধ্যার সময় মেঘটা বেশ ঘনিয়ে এসেছিল। সমস্ত আকাশ ভীষণ কালো হয়ে উঠেছিল। অমাবস্যার রাত। বাইরে বাতাসের শোঁ শোঁ শব্দ হচ্ছে।

ফোনটা মুখের কাছে ধরে শান্তনু বললো,

—হ্যালো।

—হ্যাঁ, কি ব্যাপার! এত রাতে হঠাৎ ফোন।

— বাবা খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, তুমি এক্ষুণি চলে এসো।

—ডাক্তারকে কল করেছো?

—ডাক্তার দাসগুপ্তকে কল করা হয়েছে, এক্ষুণি এসে পড়বেন। তুমি এই মুহূর্তে চলে এসো।

—আমি যাচ্ছি। রিসিভারটা রেখে যাবার জন্য পা ফেলে শান্তনু।

—ভদ্রমহিলার বাবার কি অসুখ ছিল নাকি ?

ম্যানেজারবাবু কান খাড়া করে সব কথা শুনেছেন। আজকাল-কার এই ছেলে মেয়েদের প্রেম প্রেম খেলা তাঁর বেশ ভালই লাগে। নিজের জীবনে তো এই স্বপ্নসুখ ভোগ করার সুযোগ পান নি। অল্প বয়সে তার বিয়ে হয়ে যায়।

কথা বলার জন্য দেরী করেনা শান্তনু। ঘরে এসে চট্‌পট্‌ তৈরী হয়ে নেয়, রেন কোটটা গায়ে গলিয়ে নিয়ে টুপিটা মাথায় দিয়ে বেরিয়ে পড়ে।

মাত্র আজ সে যায়নি। এর মধ্যে জয়দেববাবুর অবস্থা এত গুরুতর হলো কি করে ? কালকে দেখেছে, জ্বর আছে গায়ে, তবে উত্তাপ খুব একটা মারাত্মক ছিল না। অনিয়মে জ্বর অনেকেরই হয়ে থাকে।

জল-ঝড় মাথায় করে শান্তনু এসে সুমিতাদের বাসায় হাজির হলো। গেটটা ভেজানো।

সুমিতা রান্নাঘরে তখন খেতে বসেছে, পরপর দুটো ঘরই তাদের অন্ধকার ছিল, রান্না ঘরে শুধু একটা আলো জ্বলছিল। সামনের ঘরটার দরজা ভেজানো ছিল।

—কে শান্তনুদা ? ভেতরে এস।

শান্তনুর গলা শুনে রান্না ঘর থেকেই সাড়া দেয় সুমিতা।

—ঘর অন্ধকার কেন ? প্রশ্ন করে শান্তনু।

—বাবা ঘুমোচ্ছে, আর আমরা এখন রান্না ঘরে, ঘরে আলো জ্বালার প্রয়োজন নেই। সামনের ঘরের ভেতরকার দরজা দিয়ে আর একখানা ঘরে যেতে হয়। এই ঘরে মা আর মেয়ে শোয়।

রান্না ঘরে দরজার সামনে এসে দাঁড়ায় শান্তনু। সুমিতা দিব্যি মা'র সংগে বসে গল্প করছে। ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে শান্তনু একটু অবাক হয়, সে তাকায় একবার সুমিতার দিকে, একবার তার মা'র দিকে।

—তুমি এত রাতে এই দুর্যোগের মধ্যে ?

বললেন সুমিতার মা। এত রাতে শান্তনু কোনদিন আসেনি। তার ওপর আজকের রাতে কেউ ঘর থেকে বেরয় না। অথচ —

—আমি ফোন পেয়ে এলাম।

শান্তনুকে খুব চিন্তিত মনে হলো।

—কে তোমায় ফোন করলো ?

কৌতুহল নিয়ে তাকালো সুমিতা।

—তোমার নাম করেই বললো আমাকে, এক্ষুনি এস, বাবার অবস্থা খুব খারাপ।

—বাজে কথা, উনিতো এতক্ষণ বেশ সুস্থই ছিলেন। চাপা গম্ভীর কণ্ঠে বললেন সুমিতার মা।

—আমি আবার তোমাকে কখন ফোন করলাম। খুব অবাক হলো সুমিতা।

—এই একটু আগে তুমি আমায় ফোন করনি তাহলে ?

—না, অন্য কেউ হয়তো তোমায় ফোন করেছে।

—এত জল ঝড়ে শুধু শুধু বেরলাম তাহলে! কেউ হয়তো আমাকে ঠকাবার চেষ্টা করেছে।

—যাক তাতে আর তোমার দোষ কি।

—এত রাতে আমি তোমায় ফোন করতে যাবো কেন ? এই দুর্যোগের মধ্যে কেউ বেরোতে পারে।

—প্রয়োজন পড়লে বেরোতে হবেই।

মেজাজটা বিগড়ে যায় শান্তনুর, রাগে ফুলতে থাকে সেই মেয়েটির উপর। এই রাতে বৃষ্টির মধ্যে তাকে ঘর থেকে বের করিয়েছে।

—চলি তাহলে এখন।

আর দাঁড়ায় না শান্তনু! এতটা পথ আবার তাকে বৃষ্টির মধ্যে ভিজতে হবে।

—কাল থেকো কিন্তু।

—থাকবো, তিনটের পর যেও। চললাম মাসিমা, শান্তনু ঘর থেকে বেরিয়ে আসতেই ঘরের মধ্যে একটা শব্দ হয়। শান্তনু তখন গেটের অনেকটা কাছে চলে এসেছে।

— চোর, চোর।

এই বলে চীৎকার করে সুমিতার মা ছুটে ঘরে আসেন সুমিতাও মার পেছন পেছন ঘরে ঢোকে। আলো জ্বালিয়ে সুমিতার মা গলা ফাটিয়ে চীৎকার সুরু করে দেন।

—খুন, খুন, ধরো, ধরো।

আর সব ভাড়াটেরাও ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে এই চীৎকার শুনে। তারা ছুটে আসে জয়দেববাবুর ঘরে।

জয়দেববাবুর প্রাণহীণ দেহটা পড়ে রয়েছে বিছানার উপর। গলা টিপে তাকে হত্যা করা হয়েছে। জিব বেরিয়ে এসেছে মুখ থেকে। চোখ দুটো বড় বড় হয়ে গেছে। সমস্ত দেহটা কুঁকড়ে গেছে। বিছানার চাদরটাও কুঁচকে গেছে।

প্রদীপ দত্ত বাড়ির দিকে আসছিল, রাস্তায় শান্তনুর সংগে তার দেখা। বাড়ির ভেতর ভীষণ গণ্ডগোল বেধে গেছে শুনে, শান্তনু দাঁড়িয়ে পড়েছিল।

প্রদীপ তার কাঁধে একটা হাত রেখে বললে—চলুন বাড়ীর মধ্যে।

—আমি এইতো বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলাম।

বাড়ির বাইরে লোকজন ছুটে এলো। ঘিরে ধরলো শান্তনুকে। সকলে এক সংগে বলে উঠলো, শান্তনুই খুন করেছে জয়দেববাবুকে। একজন ভাড়াটে বৃন্দাবনবাবু ছুটলেন থানায়।

—আপনারা ওকে ধরে রাখুন, আমি পুলিসে খবর দিয়ে আ স।

—আমি খুন করেছি? কি বলছেন আপনারা? শান্তনু বিস্মিত হয়ে চেয়ে থাকে তাদের দিকে।

—ঘটনা যখন একটা ঘটেছে, তখন তো আর আমরা আপনাকে ছাড়তে পারি না।

—টেনে টেনে বিদ্রূপের সুরে বললো প্রদীপ। বিশ্বাস করুন, আমি এর কিছুই জানি না। সে প্রতিবাদ করবার চেষ্টা কল্লে।

—কোর্টে বলবেন ওসব কথা, অত রাতে এই দুর্যোগের মধ্যে বিনা উদ্দেশ্যে কেউ বেড়াতে আসে না। চলুন, বৃষ্টির মধ্যে না ভিজে ঘরে যাওয়া যাক।

প্রদীপ সকলকেই বাড়ির মধ্যে যেতে বলে। বেশ ভিড় জমে গিয়েছিল গেটের সামনে। সকলেই সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকায় শান্তনুর দিকে। সে চুপ হয়ে থাকে।

প্রদীপের পরণে ছিল প্যান্ট আর শার্ট। জলে ভিজে তাও একেবারে গায়ের সংগে লেপটে গেছে।

তীব্র কটাক্ষে সকলেই শান্তনুকে বিব্রত করে তুললো। শান্তনুর কথা কেউই শুনতে রাজী নয়। প্রদীপ তাকে কোন কথা বলতে দিচ্ছে না। বাড়ির ভেতরে সকলেই তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে রইলো। শান্তনুও বিস্ময় নেত্রে তাকিয়ে থাকে তাদের দিকে।

সুমিতা এক কোণে বসে কাঁদছে, তার মা গলা ছেড়ে কান্না জুড়ে দিয়েছে।

—কি সর্বনাশ হলো আমার, শান্তনু আমার এমন সর্বনাশ করবে কল্পনাও করতে পারিনি।

বাড়ির আর সব মহিলারাও শান্তনুকেই খুনের দায়ে দোষী সাব্যস্ত করে, তারা জানালা দিয়ে শান্তনুকেই যেতে দেখছে। দরজা খুলে ওর পেছনটাই দেখছে। খুন যে সে করেছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

কেউ কেউ তাকে মারতে উদ্যতও হয়েছিল কিন্তু প্রদীপ তাদের নিষেধ করছে।

—ভদ্রলোকের ছেলের গায়ে হাত দিতে নেই।

স্থানীয় থানার দারোগা ও কয়েকজন পুলিশ ছুটে আসে। বৃন্দাবনবাবু আগে আগে আসছেন তাদের সংগে।

দারোগাবাবু সব কথা শুনে শান্তনুকে সন্দেহ করলেন। পুলিশদের য়্যারেষ্ট করতে বললেন। শান্তনুর রেন কোর্টের পকেট থেকে একথা গ্লাভস পাওয়া গেল, গ্লাভস হাতে দিয়ে জয়দেববাবুকে হত্যা করা হয়েছে।

সকালের কাগজে খবরটা বেরয়। বিশিষ্ট অধ্যাপক জয়দেব চক্রবর্তী আততায়ীর হাতে নির্মমভাবে নিহত হয়েছেন। শান্তনু নামে এক যুবককে এই খুনের দায়ে ধরা হয়েছে।

সকালে কাগজ পড়তে পড়তে বিশ্বময়ের চোখে পড়ে এ খবরটা। সে আঁতকে ওঠে সংগে সংগে। শান্তনু অন্য কারও নাম হতে পারে, কিন্তু জয়দেববাবুর নামতো সে শুনেছে অনেকবার। শান্তনুই নামটা বলেছে তাকে। সুমিতার বাবা প্রফেসার মানুষ, নিশ্চয়ই এ আমার বন্ধু শান্তনুই করেছে এ কাজটা।

সঙ্গে সঙ্গে মেসে ফোন করে বিশ্বময়। ম্যানেজার জয়গোপাল বাবুর মুখে শুনতে পেলো সব। তার মেসে পুলিশ এসেছিল। শান্তনুবাবুর ঘর তছ্‌নছ্‌ করে খুঁজে গেছে।

বীণার কানেও খবরটা আসে। দাদার ঘরে এসে দাদাকে অস্বাভাবিক রকমের গম্ভীর দেখে বীণা জিজ্ঞাসা করে।

—কি হয়েছে দাদা? এত সকালে কে ফোন করলো?

—আজকের কাগজটা পড়েছিস?

—আমি—না। কেন, কি হয়েছে দাদা?

কালীর দাগ দেওয়া লাইন কটা পড়তে বললো বীণাকে বিশ্বময়। পড়তে পড়তে বীণার চোখ দুটো বড় বড় হয়ে উঠলো। সেও গম্ভীর হয়ে গেল খুব।

—কি সর্বনাশ। শান্তনুদা একাজ কিছুতেই করতে পারেন না।

—তোর কি মনে হয়, এর মধ্যে কোন ষড়যন্ত্র আছে? জেরার ঢংয়ে বললো বিশ্বময়।

—হ্যাঁ। সুমিতার প্রতি প্রদীপের খুব দুর্বলতা আছে। তাকে সে বিয়ে করতে চায়।

—জয়দেববাবুর বাড়িওয়ালা?

—তুই চিনিস তাকে?

—খুব চিনি। লোকটা খুব উচ্ছৃঙ্খল।

—আমি বেরোচ্ছি এখনই। মাকে বলিস, কখন ফিরবো ঠিক নেই। আর হ্যাঁ, মাকে এখন বলিস না কিছু।

বেরোবার জন্য জামা প্যাণ্ট পরতে সুরু করে বিশ্বময়। ক্রিং ক্রিং করে ফোন বেজে উঠলো। হাত বাড়িয়ে রিসিভারটা তুলে নেয় সে।

—হ্যালো।

—আমি শান্তনু কথা বলছি। তুই প্লীডার। আজকের কাগজে একটা নিউজ নিশ্চয় পড়েছিস?

ওপাশ থেকে শান্তনুর গলা ভেসে এলো।

—তুই কেন এই কাজ করতে গেলি?

বিশ্বময় একটু গম্ভীর কণ্ঠে বললো।

—তুই একথা বিশ্বাস করছিস?

—এখন কোথায় আছিস তুই?

—থানার হাজতেই আছি। বোধ হয় বিকাল নাগাদ জেল হাজতে পাঠাবে আমাকে।

—আমি শুনেছি কিছু কিছু। যাচ্ছি আমি।

রিসিভারটা রেখে দিয়ে তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নেয় বিশ্বময়।

॥ নয় ॥

এদিকে প্রদীপ দত্ত রুখে দাঁড়িয়েছে। শান্তনুকে সে খুনী প্রমাণ করবেই। প্রদীপের পক্ষেও সাক্ষীর সংখ্যা কম নেই। বাড়ির সকলেই তার পক্ষে। সুমিতা আর সুমিতার মা তো রয়েছেই। থানার দারোগারও ধারণা, কোর্ট শান্তনুকে খুনী বলেই ঘোষণা করবে। শান্তনু শাস্তি পাবেই। নিস্তার নেই তার।

বিশ্বময়ও আপ্রাণ চেষ্টা করছে, তাকে সে বাঁচাবেই। ছাড়িয়ে আনবেই সে তাকে। পুলিশের রিপোর্ট শান্তনুর বিপক্ষে। পুলিশের স্থির বিশ্বাস শান্তনুই হত্যা করেছে জয়দেববাবুকে। যে গ্লাভ্স পরে জয়দেববাবুকে খুন করা হয়েছে, সেটাও শান্তনুর রেনকোটের পকেটে পাওয়া গেছে। জয়দেববাবুর ঘরে তার জুতোর ছাপ রয়েছে।

বিশ্বময়ের স্থির বিশ্বাস, শান্তনু কোন মতেই খুন করতে পারে না। প্রদীপ দত্তরই কাজ এটা। নিশ্চয়ই এরমধ্যে তার কোনো চক্রান্ত রয়েছে। যারা স্পটে ছিল, প্রত্যেকেই তার ভাড়াটে। প্রদীপের পক্ষে তারা সাক্ষী দেবেই।

নতুন উকিল সে। আইনের অনেক মার-প্যাচ তার জানা নেই। মনে বল আর সাহস নিয়ে শান্তনুকে সে আশ্বাস দিয়েছে। নতুন হলেও সে আইনের বই কম পড়েনি। প্রদীপ দত্ত ঝানু উকীল লাগালেও সে ঘাবড়াবে না কোন সময়। তাকে যদি রাতের পর রাত বই পড়তে হয় তাও পড়তে সে ত্রুটি করবে না।

বই এর পর বই সে পড়তে সুরু করে। শান্তনুকে রক্ষা করতে না পারলে তার চরম পরাজয় হবে। একজন নির্দোষ ব্যক্তি শাস্তি পেয়ে যাবে। সত্যিকারের যে খুনী সে সমাজের বুকে বুক ফুলিয়ে হাঁটবে, মনে মনে হাসবে, নিজের বুদ্ধির তারিফ করবে।

প্রদীপ দত্ত যে বুদ্ধিমান, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। পুলিশের কাছে সে প্রমাণ করেছে যে, সে তখন বাড়িতে ছিল না। তার নিজের কথাও তাই। সে বাড়িতে ঢুকছিল। গেটের মুখে সে শান্তনুকে দেখতে পায়। বাড়ির ভেতর একটা গোলমালের শব্দ শুনে শান্তনুর গতিরোধ করে দাঁড়ায়।

শান্তনুকে সে শয়তান ও চরিত্রহীন বলেই জানে। সে সুমিতার সংগে প্রেমের অভিনয় করছে। সে অন্য মেয়ের সংগেও মেলামেশা করে। পুলিশকে সে ছবি দখিয়েছে। সুমিতার বাবা তাকে অন্য মেয়ের সংগে দেখে ফেলেন বলে, ভয়ে সে জয়দেববাবুকে হত্যা করে। সুমিতা যাতে জানতে না পারে।

॥ দশ ॥

কোর্টের দিন ক্রমশই খুব কাছে এগিয়ে এলো। বিশ্বময়ের দুশ্চিন্তাও ধাপে ধাপে বাড়তে থাকে। শান্তনুকে খুনী প্রমাণ করার জন্য এই কেশ কমলাকান্তবাবু হাতে নিয়েছেন। জাঁদরেল উকিল তাঁর জেরার ধারাই আলাদা।

সুনামও রয়েছে—যথেষ্ট।

বিচারপতি তাঁর কথা খুব মনোযোগ দিয়ে শুনবেন।

তিনি কেসে দাঁড়ালে অনেক বাঘা বাঘা উকিল ঘাবড়ে যায়। তাঁর মুখে যেমন খৈ ফোটে তাঁর সুচতুর বলার ভঙ্গিতে অনেকেই কাঠ গড়ায় দাঁড়িয়ে চোখে সরষে ফুল দেখে।

প্রদীপ দত্ত কোনদিকে কোন ত্রুটি রাখেনি। সুমিতাকে শান্তনুর পক্ষে পাবে ভেবেছিল বিশ্বময়, সুমিতাও আজ ভীষণ রেগে গেছে

সুমিতার মনকে বিষিয়ে তুলেছে শান্তনুর ওপর এমন সে যে নির্মম

হয়ে উঠেছে, এই মুহূর্তে যদি শান্তনুর ফাঁসি হয়ে যায়, সে একটুও বিচলিত হবে না। পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেওয়া হলো মনে করে খুশিই হবে বরং।

খবর শুনেই সেদিন সকালে বিশ্বময় দেখা করতে গিয়েছিল সুমিতার সংগে। তার মার সংগে আলাপ করেছে সে। আগ্রা থেকে লেখা প্রদীপ দত্তর চিঠিটা সে নিয়ে এসেছিল। চিঠিটা পড়ার পর আর ফেরত দেয়নি।

হয়তো চিঠিটা নিতে ভুলে গিয়েছিলেন সুমিতার মা।

বাড়িটাও ঘুরে দেখে এসেছে বিশ্বময়। বাড়িটার একটা ছবি মনে মনে এঁকে এনেছে। তার মেসে খুব সাহায্য করবে।

জানালা দিয়ে প্রদীপ দত্তর ঘরের ভেতরটা দেখছে।

দশটায় কোর্ট সুরু হবে। যথাসময়ে সকলেই কোর্টে এসে হাজির হলো। পাড়ার কিছু লোকও এলো বিচার দেখতে। সুমিতা এবং সুমিতার মাও এলেন ঠিক সময় মতো। প্রদীপ দত্ত একা এলো সকলের শেষে। কমলাকান্তবাবুকে ডেকে শেষবারের মতো হয়তো কিছু বললো তাকে।

পরণে দামী পোষাক। শান্তনুর পক্ষে বলার মত কেউ নেই। বিশ্বময় অবশ্য মেসের ম্যানেজারকে আসতে অনুরোধ করে এসেছিল। ফোনের কথাটা সে ছাড়া আর কেউ জানে না।

আসামী শান্তনুকে এনে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হল। ফরিয়াদী পক্ষের উকিল কমলাকান্তবাবু আসামীকে জেরা সুরু করলেন।

—আপনি জয়দেববাবুকে হত্যা করেছেন?

—না। এ ব্যাপারে আমি কিছুই জানি না। সাহসের সংগে তীব্র প্রতিবাদ করে শান্তনু।

উকিলের পোশাক পরা বিশ্বময় একটি চেয়ারে বসে আছে। হাতে তার কাগজ কলম।

—দুর্যোগের দিনে অত রাতে আপনার আসার করণটা আমরা জানতে পারি কি?

তির্যক দৃষ্টিতে তিনি একবার তাকালেন আসামী শান্তনুর দিকে।

—আমি জয়দেববাবুর বাড়ী প্রায়ই আসতাম। তাঁর কন্যা সুমিতাকে আমি ভালবাসতা·

কথার মাঝপথে শান্তনুকে থামিয়ে দিয়ে কমলাকান্তবাবু বললেন—সুমিতা দেবী কি একথা স্বীকার করবেন?

—নিশ্চয়ই করবে। বেশ জোরের সঙ্গে বলে শান্তনু।

—প্রদীপবাবুর মানে যিনি এই কেসের প্রধান উদ্যোক্তা তিনি বলেছেন,—একদিন সুমিতা দেবীকে আপনি একটা গুরুতর দুর্ঘটনায় সাহায্য করেছিলেন বলে তাই আপনার প্রতি তাঁর একটা বিশেষ সহানুভূতি ছিল।

—মিথ্যে কথা। সুমিতা আমায় ভালবাসে। সে আমাকে বিয়ে করতে রাজী আছে।

—একজন খুনীকে তিনি বিয়ে করতে রাজী আছেন? একথা কি করে উচ্চারণ করলেন আপনি?

কমলাকান্তবাবুর এ কথা শুনে সংগে সংগে বিশ্বময় দাঁড়িয়ে বললো।

—অবজেক্ট ইওর অনার! একজন শিক্ষিত ভদ্রলোককে অপমান করার কোন অধিকার কমলাস্তবাবুর নেই। শান্তনু যে খুনী, কোর্টের কাছে তা এখনও প্রমাণ হয়নি। খুনী সন্দেহে তাকে ধরা হয়েছে।

—আমার লার্নেড জুনিয়র ফ্রেণ্ড এতেই উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন। কোনো শিক্ষিত ভদ্রলোক ওই দুর্যোগপূর্ণ রাত্রে কারোর বাড়িতে

যেতে পারে না। নিশ্চয়ই কোনো অসৎ উদ্দেশ্য ছিল তার। কমলাকান্ত বাবু আবার তাকালেন শান্তনুর দিকে।

—আমি ঘরেই ছিলাম। মেসের বেয়ারা এসে আমাকে খবর দেয়, ফোন এসেছে আমার নামে। আমি ফোন ধরতেই একটি মেয়ের কণ্ঠস্বর পাই। সুমিতার গলা বলেই মনে হলো। বাবা খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, তুমি এক্ষুনি এসো।

—একথা শুনে আপনি অমনি ছুটলেন ?

—মানবিকতার দিক থেকে আমার তখন যাওয়াই উচিৎ। বিশেষ করে সুমিতার একমাত্র প্রিয়জন বলতে আমিই।

—মিথ্যে কথা। সম্পূর্ণ আপনার মন গড়া। সুমিতা আপনাকে কখনও ফোন করেনি। সুমিতা দেবী এবং তাঁর মা একথা স্বীকার করেন না। জয়দেববাবু সম্পূর্ণ সুস্থ শরীরে ছিলেন। সন্ধ্যাবেলায়ও তাঁকে অনেক পথে হাঁটতে দেখেছে। জয়দেববাবুর ওপর আপনার রাগ ছিল।

বিশ্বময় আবার দাঁড়িয়ে পড়ে। বলে—ইওর অনার! আমার মাননীয় বন্ধু ফোনের কথা অস্বীকার করেন। সুমিতা দেবী যে ফোন করেনি একথা হয়তো ঠিক আমিও তা স্বীকার করছি, কিন্তু শান্তনুর নামে ফোন একটা করা হয়েছিল। ফোনে একটি মেয়ের গলাও শোনা গিয়েছিল। বাঙালী মেসের ম্যানেজার হরগোপালবাবুকে ডাকা হোক। তাঁর মুখেই সব কথা শোনা যাবে।

বিচারপতির নির্দেশে হরগোপালবাবুকে ডাকা হলো। তিনি এই একটু আগে এসেছেন। ডাক পড়ায় সাক্ষীর কাঠগড়ায় এসে দাঁড়ালেন তিনি।

—দোষী শাস্তি পাক, এটা নিশ্চয়ই আপনি চান ?

—হেঃ হেঃ, এটা চাইব না কেন। খুনীকে বাড়তে দেওয়া নিশ্চয়ই উচিৎ হবে না।

—তাহলে আপনি নিশ্চয়ই এমন কিছু বলবেন না, যাতে খুনী মুক্তি পেতে সাহায্য পায়।

—য়া সত্যি তাই বলবো।

—শান্তনুকে আপনি চেনেন ?

—বিলক্ষণ, আমার মেসের সেরা ছেলে।

—অবান্তর কথা না বলে, আমার কথার উত্তর দিন। গম্ভীর স্বরে বললেন কমলাকান্তবাবু।

—কেন, আপনার ভয়ে ? আমি শান্তনুকে চিনি অনেকদিন থেকে। আমার মেসে থেকেই তিনি বি. এ. পাশ করছেন। এবার এম. এ. দিয়েছেন। আমি তাঁকে বেশ ভালভাবে চিনি।

হরগোপালবাবুকে থামিয়ে দিয়ে চাপা কণ্ঠে বললেন কমলাকান্তবাবু।

—আপনার বক্তৃতা শোনার জন্য এখানে আপনাকে ডাকা হয়নি। সেদিন কি আসামীর নামে কোন ফোন এসেছিল ?

—হ্যাঁ। রিসিভারটা প্রথম আমি তুলি। আমার টেবিলেই ফোন থাকে। আমি তাঁকে রসিকতা করে বলেছিলাম, আজ বুঝি সুমিতা দেবীর সংগে দেখা করেন নি ?

—সুমিতাকে আপনি চেনেন ?

—বিলক্ষণ চিনি। তিনি ওই তো এক কোণে বসে আছেন। আঙুল দিয়ে সুমিতাকে দেখিয়ে দেন হরগোপালবাবু।

—সুমিতাকে আপনি চিনলেন কি করে ?

—সুমিতা দেবী প্রায়ই আসতেন মেসে। শান্তনুর সংগে তাঁর খুব ভাব তাইতো শান্তনুকে আমি ওকথা বলেছিলাম। আমি ফোন ধরতেই সুমিতা দেবী বলেছিলেন, খুব জরুরী ওকে ডেকে দিন।

—যাক্, আমার প্রশ্ন হয়েছে। এবার আপনি যেতে পারেন।

কমলাকান্তবাবু তাঁর চেয়ারে এসে বসলেন। হরগোপালবাবু কাঠগড়া থেকে নামতে যাচ্ছিলেন এমন সময় বিশ্বময় উঠলো।

—দাঁড়ান হরগোপালবাবু! ওই দুর্যোগপূর্ণ রাত্রে সুমিতা নামে জনৈকা মহিলা শান্তনুকে ফোনে ডেকেছিল?

—হ্যাঁ, শান্তনুবাবু যখন ফোনে কথা বলছিলেন, আমি পাশেই দাঁড়িয়েছিলাম। শান্তনুর সব কথাই শুনেছি। মেয়েটির কণ্ঠও কানে এসেছে মাঝে মাঝে।

—ইওর অনার! এ পয়েণ্টটা অবশ্যই নোট করবেন। আসামী শান্তনু তার ঘরেই ছিল। সত্যিকারের যে খুনী, সে শান্তনুকে জড়াবার জন্য কোনো মেয়েকে ফোনে তাকে ডেকে আনে জয়দেব বাবুর বাড়িতে। তারপর প্রকৃত খুনী সুযোগ বুঝে গা ঢাকা দেয়।

—ইওর অনার, আমার জুনিয়র ফ্রেণ্ড নিঃসন্দেহে খুব বুদ্ধিমান। আসামী নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করার জন্য কাউকে দিয়ে ফোন করাতে পারেন তো।

একটা চাপা উত্তেজনার ভাব দেখা দেয় দর্শকদের মধ্যে। গুঞ্জন ওঠে একটা। সংগে সংগে বিচারপতি মশাই টেবিলে কাঠের হাতুড়ি ঠুকতে ঠুকতে বলেন—অর্ডার, অর্ডার। সাময়িকভাবে সকলে চুপ করে।

কমলাকান্তবাবু আবার উঠে শান্তনুর কাছে এগিয়ে এলেন।

শান্তনুর দিকে তাকালেন।

—আপনি ক'দিন গেছেন সুমিতাদের বাড়ি?

—অনেকদিন।

—ভাড়াটেরা সবাই আপনাকে চেনে নিশ্চয়ই?

—চিনতে পারে।

—বৃন্দাবনবাবু বা সরোজবাবু কারোর সংগে নিশ্চয়ই আপনার কোনো ঝগড়া হয়নি।

—না। আলাপই হয়নি তাঁদের সংগে।

—তাঁরা নিশ্চয়ই অযথা আপনার সম্পর্কে মিথ্যে কথা বলবেন না। তাঁরা প্রত্যেকেই রায় দিয়েছেন, আপনাকে তাঁরা খুন করে

পালাতে দেখেছেন।

—মিথ্যে কথা। খুন আমি করিনি। জয়দেববাবু অসুস্থ শুনে আমি তাঁকে দেখতে গিয়েছিলাম।

বিশ্বময় চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় আবার।

—ইওর অনার! সাক্ষীদের এক একজনকে ডাকতে আমি কমলাকান্তবাবুকে অনুরোধ করছি। আর আমি আপনার সামনে প্রদীপবাবুর বাড়ির ড্রইংটা রাখছি।

কমলাকান্তবাবু প্রথমে বৃন্দাবনবাবুকে আসতে বললেন।

তিনি এলেন। বৃন্দাবনবাবু শপথ বাণী পাঠ করলেন। কমলাকান্তবাবু জেরা শুরু করলেন।

—আপনি জয়দেববাবুর খুনী আসামী শান্তনুবাবুকে কি অবস্থাতে পালাতে দেখেছেন?

—আমি দেখি শান্তনুবাবু ছুটে গেটের দিকে পালিয়ে যাচ্ছেন। আমিও পেছন পেছন ছুটে যাই। প্রদীপবাবু তাকে গেটের মুখে ধরে ফেলেন। আমি থানায় খবর দিতে ছুটি।

—ইওর অনার। সাক্ষী বৃন্দাবনবাবুকে আমার ক'টা প্রশ্ন করার আছে। এই বলে বিশ্বময় সাক্ষীর কাঠগড়ার দিকে এগিয়ে যায়।

—আপনি এইমাত্র গীতা আর গঙ্গাজল হাতে নিয়ে শপথ করেছেন সত্য ছাড়া মিথ্যা বলবেন না। আমিও আশা করি, আপনি আপনার শপথ রক্ষা করবেন।

এবার বলুন তো সেই দুর্যোগপূর্ণ রাত্রে আপনি কি দরজা জানালা খুলে বৃষ্টিতে বাইরে দাঁড়িয়েছিলেন? রাতও তো তখন কম নয়।

—বৃষ্টির মধ্যে থাকবো কেন। ঘরেই ছিলাম।

—দরজা জানালাও বন্ধ ছিল নিশ্চয়ই।

—তা হয়তো ছিল।

—হয়তো কেন, বলুন ছিল। কারোর প্ররোচনায় পড়ে মিথ্যে বলবার চেষ্টা করবেন না।

—মিথ্যে কথা আমি জীবনে বলিনি

—হ্যাঁ, সত্যি যা দেখেছেন সেটাই বলবেন।

—অবজেক্ট ইওর অনার।

কমলাকান্তবাবু বিচারপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

বিচারপতি বলেন—ক্যারি অন।

—আচ্ছা বৃন্দাবনবাবু, আপনি তখন বিছানায় শুয়েছিলেন। আগের দিন আপনার নাইট ডিউটি ছিল নিশ্চয়ই।

—তা ছিল। আমি একটা শব্দ শুনে দরজা খুলে দেখি অঝোরে বৃষ্টি নেমেছে সঙ্গে সঙ্গে ঝড়ের বেগও খুব। তারপর দেখি শান্তনুবাবু গেটের দিকে ছুটে যাচ্ছেন।

—তার মানে, আপনি আসামীর পালানোর দিকটা দেখেছেন, মুখ দেখতে পাননি। জয়দেববাবুর পরে হচ্ছে আপনার ঘর, আসামীর মুখ দেখা আপনার পক্ষে সম্ভব নয়।

—মুখ না দেখলেও, সুমিতার মা চীৎকার করে উঠেছিলেন।

—প্রদীপবাবু আসামী শান্তনুকে গেটের বাইরে রাস্তায় ধরেন। প্রদীপবাবুকে আপনি খুব বিশ্বাস করেন তাই না? প্রদীপবাবু বললেন, আসামী শান্তনু খুনী, আর অমনি তা বিশ্বাস করলেন। আসামীর মুখ না দেখেই তাঁকে আপনি খুনী বলে সনাক্ত করলেন কি করে? সাক্ষী সরোজবাবুর বেলায়ও এই একই কথার পুনরাবৃত্তি হলো। আদালত কক্ষ প্রহসন কক্ষে পরিণত হলো। বিশ্বময়ের নির্দেশে সুমিতার মা এলেন কাঠগড়ায়।

—আপনার এই মানসিক দুরবস্থার দিনে আপনাকে বিরক্ত করার জন্য আমি দুঃখিত। কিন্তু কর্তব্যের খাতিরে আপনাকে কয়েকটি প্রশ্ন করবো আমি। আশা করবো আপনি আমার প্রশ্নের যথাযথ জবাব দিয়ে প্রকৃত খুনীকে দোষী সাব্যস্ত করার এবং তাকে কঠোর সাজা দেবার সুযোগ দেবেন।

—করুন। কপাল যখন ভেঙেছে, তখন আর আমার দুঃখ কিসের।

—এবার বলুন তো আপনি আসামী শান্তনুকে কি রকম ছেলে বলে জানতেন ?

—ভালই।

—ভালো তো বটেই। নইলে আপনার মেয়ের সঙ্গে মেশবার সুযোগ দেবেন কেন। তারা এক সঙ্গে আগ্রা পর্যন্ত বেড়াতে গিয়েছিল। বিয়ের কথাও তাদের হয়েছে।

—তাতো হয়েছিল। তখন কি বুঝেছিলাম, দুধ কলা দিয়ে কাল সাপ পুষেছিলাম। ও যে আমার এতবড় সর্বনাশ করবে, ভাবতেই পারিনি কোনদিন।

—আপনার স্বামীকে খুন করার পেছনে ওর কি কিছু স্বার্থ আছে বলে আপনি মনে করেন ?

—স্বার্থ হয়তো আছে একটা—

—সেটাইতো আমি জানতে চাইছি। কারোর শেখানো বুলি আপনি বলবেন না। চেয়ে দেখুন আসামীর দিকে। ওই শান্তনুকে একদিন আপনি স্নেহ করতেন, ভালবাসতেন। যতদূর জানা গেছে, স্বর্গত জয়দেববাবুও ওকে যথেষ্ট স্নেহ করতেন, বিশ্বাস করতেন। ওকে নিজের ছেলের মতই স্নেহ করতেন।

—মিথ্যে দায়ে ও দোষী সাব্যস্ত হোক, এটা নিশ্চয়ই আপনি চান না। খুন হয়তো সত্যিকারের ও করেনি।

—কে করেছে তাহলে ?

—সেটাইতো আমাদের আবিষ্কার করতে হবে। আসল খুনী হয়তো আমাদের সামনে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

—কে সে। কোথায় সে ?

—এখনই জানতে পারবেন।

—আমার পতিঘাতীকে এখুনি দেখতে চাই।

—সে ব্যবস্থাই হচ্ছে। এবার বলুন তো শান্তনুকে আপনার খুনী বলে সন্দেহ হলো কেন ?

—ও বেরিয়ে যাবার একটু পরেই ঘরের মধ্যে একটা শব্দ হতেই আমি রান্না ঘর থেকে ছুটে আসি। লাইট জ্বালতেই যে দৃশ্য চোখে পড়ে, তাতে আমার মাথা ঘুরে যায়।

—আপনি দিশাহারা হয়েই শান্তনুকেই খুনী সাব্যস্ত করেন, তাইতো ?

—ঘরের মধ্যে তখন তো আর কেউ ছিল না।

—তা হয়তো ছিল না। কিন্তু আপনাদের ঘর দু'খানা অনেকক্ষণ থেকেই অন্ধকার হয়ে পড়েছিল। আপনি এবং সুমিতা রান্না ঘরেই ছিলেন। এই অবসরে অন্য কেউ ঘরে ঢুকে জয়দেববাবুকে হত্যা করতে পারে। জয়দেববাবুর শরীর এমনিতেই খুব দুর্বল ছিল। তার ওপর তিনি তখন ঘুমিয়েছিলেন।

—আমার স্বামী বেশ সুস্থই ছিলেন।

—আবার কেন মিথ্যার আশ্রয় নিচ্ছেন আপনি ? আগ্রা থেকে ফেরার পথেই তাঁর জ্বর হয়। সেই থেকে তিনি বিছানায় শয্যাগত। কলেজে যাননি পর্যন্ত। আপনি প্রদীপবাবুর কথায় সায় দেবেন এটা কি ঠিক ?

সুমিতার মা কিছুক্ষণের জন্য বোবা হয়ে যান। কি বলবেন ভেবে পান না। শান্তনুকে তিনি স্নেহ করেন যথেষ্ট। অপরদিকে প্রদীপ তাদের হয়ে সাহায্য করছে খুব। তার শেখানো কথা গুলিয়ে যাচ্ছে তাঁর। এ কথার কি উত্তর দিলে ঠিক হবে তা তিনি বুঝে উঠতে পারছেন না। এই অবসরে কমলাকান্তবাবু উঠে দাঁড়ালেন।

—ইওর অনার! এবার ওনাকে ছেড়ে দেওয়া উচিত। আমার জুনিয়ার ফ্রেণ্ড তাঁকে যথেষ্ট জেরা করেছেন।

—আপনার কি আরও প্রশ্ন করবার আছে ?

বিচারপতি মশাই বিশ্বময়কে প্রশ্ন করেন।

—আছে স্যার ভারতীয় দণ্ডবিধিতে আমাদের প্রতি প্রথম নির্দেশনামা আছে, দোষী শাস্তি পাক, কিন্তু কোন ক্রমে যেন নির্দোষী

শাস্তি না পায়। এক্ষেত্রে সেই অঘটন ঘটবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। অতএব সাক্ষীকে জেরা করার আরও কিছুটা সময় প্রার্থনা করছি।

—আচ্ছা করুন।

—আপনার কথাটার তাৎপর্য খুব অস্পষ্ট রয়ে গেল। আপনি কি বলতে চাইছেন ?

বিশ্বময়কে প্রশ্ন করেন কমলাকান্তবাবু।

—আমি সহজ, সরল বাংলা ভাষাতেই বলেছি। আপনি যদি না বুঝে থাকেন, তাহলে আমি দুঃখিত। আপনাকে বোঝবার জন্য আমি আমার অমূল্য সময় নষ্ট করতে চাই না।

বিশ্বময় খুব স্পষ্ট ভাষায় তীব্র বিদ্রূপ করলো কমলাকান্তবাবুকে। তিনি রেগে গিয়ে বসে পড়লেন চেয়ারে।

—আচ্ছা, আপনি যখন শাস্তনুর সংগে কথা বলছিলেন তখন সে কোথায় ছিল ?

—রান্না ঘরের সামনে এসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল।

—আচ্ছা প্রদীপবাবুকে আপনি সেদিন শেষ কখন দেখেন ?

—বেলা...

—বেলা নয়, রাত ক'টার সময় ?

—তা রাত ন'টা নাগাদ হবে।

—কি অবস্থায় দেখেছেন ?

—তার ঘরে।

—আপনি এখন যেতে পারেন। ইওর অনার! আর একটা পয়েন্ট নোট করবার আছে।

সেদিন আটটার পর থেকেই বৃষ্টি সুরু হয়েছিল। ঘরে রেন কোট থাকতে সেটা সংগে না নিয়ে কেউই বৃষ্টির মধ্যে কোথাও বেরোয় না। প্রদীপবাবু তাঁর রিপোর্টে বলেছেন, তিনি সন্ধ্যার পর বাড়িতে ছিলেন না। একটু আগে যা শোনা গেল, তাতে তিনি ছিলেন তাই প্রমাণ হয়। তার ওপর আর একটা প্রমাণ আছে। পুলিশ

যখন বাড়িতে আসেন, তখন তাঁর ঘরেও যান তাঁরা। তাঁর খাটের ওপর রেন কোর্ট ছিল। কিন্তু তাতে জল ছিল না। আর ন'টার পর যদি তিনি কোথাও বেরোতেন, নিশ্চয়ই রেন্ কোটটা ফেলে যেতেন না। কেউ ইচ্ছা করে জিনিস থাকতে বৃষ্টিতে ভেজেন না।

—এই কেসে প্রদীপবাবু একজন প্রধান সাক্ষী। তার প্রতি জঘন্য ইঙ্গিত ইনটলারেব্ল।

বিশ্বময়ের এ কথার প্রতিবাদ করেন কমলাকান্তবাবু।

—ক্যারি অন ক্যারি অন।

বিচারপতি মশাই বিশ্বময়কে বলার জন্য নির্দেশ দেন।

সুমিতার মা কাঠগড়া থেকে নেমে দর্শকের আসনে এসে বসলেন। প্রদীপ দত্ত একটু চিন্তিত হয়ে পড়েন। সাজিয়ে গুছিয়ে বলে দেওয়া সত্ত্বেও সুমিতার মা গুছিয়ে বলতে পারলেন না।

সুমিতাকে না ডেকে বিশ্বময় প্রদীপ দত্তকে কাঠগড়ায় আসতে অনুরোধ করলো। মন্থর গতিতে ভীতিবিহ্বল নেত্রে প্রদীপ এসে কাঠগড়ায় উঠে দাঁড়াল। শপথ বাণী পাঠ করেই সে বললো,

—আমার যা বক্তব্য আমি তা কোর্টকে জানিয়েছি। নতুন কি আর আপনি জানতে চান?

—আপনি খুব বুদ্ধিমান এবং বিচক্ষণ। আপনার সংগে একটু আলাপ করবার ইচ্ছে হলো। আচ্ছা সুমিতা দেবীকে আপনি ভালবাসতেন তাই না?

—মানে···

—হ্যাঁ কি না তাই বলুন। সুমিতা দেবী এই ঘরেই আছেন। আপনি তাঁকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন?

—হ্যাঁ। সুমিতা এবং তাঁর মা'র এতে যথেষ্ট মত ছিল।

—শুধু জয়দেববাবু একটু বিরোধিতা করেছিলেন। তিনি আপনার মতো একজন সুপাত্রের হাতে কন্যাকে তুলে দিতে রাজী ছিলেন না। এই তো?

—ঠিক তা নয়। শান্তনুবাবু আমার সম্পর্কে অনেক আজেবাজে কথা জয়দেববাবুর কানে তোলেন।

—প্রদীপবাবু! যে অন্যায় করে, সেই অন্যায়ের শাস্তি আর একজনের মাথায় চাপিয়ে দিতে খুব মজা লাগে তাই না? আমি আপনাকে বিশেষভাবে চিনি। আমার কাছে নিজেকে আর ঢাকবার চেষ্টা করবেন না।

—অবজেক্ট ইওর অনার। আমার তরুণ বন্ধুটি খুব উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন। জেরার পদ্ধতি হয়তো তিনি ভুলে গেছেন।

কমলাকান্তবাবু বিশ্বময়কে দমিয়ে দেবার চেষ্টা করেন।

—ক্যারি অন, ক্যারি অন। বিচারপতি মহাশয় বিশ্বময়কে আইনানুগ জেরা চালিয়ে যেতে আদেশ করেন।

প্রদীপ দত্ত কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে হলের সকলের দিকে একবার তাকালেন।

বীণা রায় আসেনি আজ।

—আমি শান্তনুবাবুকে চরিত্রহীন লম্পট বলেই জানতাম। সুমিতাকে যদি তিনি সত্যই ভালবাসবেন, তাহলে দয়া করে দেখুন তো এই মেয়েটি কে।

পকেট থেকে এনলার্জ করা একটি ফটো বার করে প্রদীপ। বীণা রায় তার কাঁধে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কোর্টের সকলকে ফটোটা দেখিয়ে প্রদীপ আবার বললো।

—এ ফটোটা নিশ্চয়ই সুমিতার নয়। আমি সেদিন এই রেষ্টুরেণ্টে খেতে ঢুকেছিলাম।

—আপনি এই মেয়েটিকে চেনেন প্রদীপবাবু?

—দুনিয়ার মেয়েদের চেনা আমার স্বভাব নয়। শান্তনুবাবু চিনতে পারেন।

—আচ্ছা, বীণা রায়কে আপনি চেনেন না কেমন?

—না।

—মডার্ণ ক্লাবের সেক্রেটারী বীণা রায়কে চেনেন নিশ্চয়ই।

—মডার্ণ ক্লাব!

এমনভাবে শব্দটা উচ্চারণ করলো প্রদীপ, যেন এই ক্লাবটার সে নামই শোনেনি।

—এড়াতে পারবেন না প্রদীপবাবু। বীণা রায় আমার বোন। এই গুড নিউজটা হয়তো আপনার জানা ছিল না। ক্লাবের কাগজ-পত্তর আমাদের বাড়িতেই আছে। এখন অবশ্য সে সবই আমার হাতে। বীণা রায়কে লেখা আপনার একটা চিঠিও সেদিন আমি পেয়েছি।

—কে বীণা রায়? তার সংগে এই ফটোর কি সম্পর্ক? কমলাকান্তবাবু প্রশ্ন করলেন বিশ্বময়কে।

—এই ফটোর মেয়েটির নামই বীণা রায়। আমার বোন। আর ওই আসামী শান্তনু আমার বুজুম ফ্রেণ্ড। বীণা তাকে দাদার মতো ভক্তি করে, শ্রদ্ধা করে। বোন দাদার কাঁধে হাত দেবে, সেটা নিয়ে কারোর মাথা ঘামাবার কথা নয়। প্রদীপবাবু সুমিতার মনকে বিষিয়ে দেবার জন্যই এই ফটোটা তুলেছেন। সুমিতাদেবী কোনদিনই প্রদীপবাবুকে পছন্দ করতেন না। জয়দেববাবুও তাকে অসৎ চরিত্রের বলেই জানতেন।

—মিথ্যে কথা। গর্জে ওঠে প্রদীপ। সে বিচাপতিকে বলে।

—স্যার! আপনি সুমিতাকে ডাকার নির্দেশ দিন

—কোনো প্রয়োজন নেই সুমিতা দেবীকে ডাকবার। কোর্টের সামনে প্রদীপবাবুর লেখা একটা চিঠি রাখছি।

চিঠিটা বিচারপতির দিকে এগিয়ে দিয়ে বিশ্বময় বললো,

—কিছুদিন আগে জয়দেববাবু, সুমিতা আর শান্তনু এই তিনজনে আগ্রায় বেড়াতে যায়। পেছন পেছন প্রদীপবাবুও ধাওয়া করেন। আগ্রা থেকে এই চিঠিটা প্রদীপবাবু সুমিতার মা'কে লেখেন। আমি পূর্বেই শান্তনুকে লেখা সুমিতার চিঠিগুলি পেশ করেছি।

—ইওর অনার ! বীণা রায় যখন কোর্টে উপস্থিত নেই, কাজেই এখন তাঁর কথা না ওঠাই ভালো।

কমলাকান্তবাবু বীণা রায়ের প্রসঙ্গটা চাপা দেবার চেষ্টা করে।

—বেশ তো। আগামী তারিখে আমি বীণা রায়কে কোর্টে উপস্থিত করবো।

তুমুল উত্তেজনার মধ্যে কোর্টের কাজ সেদিনের মতো শেষ হলো। আর একটা তারিখ নির্দ্দিষ্ট করে বিচারপতি মহাশয় আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। বিচার মুলতুবী রইলো।

॥ এগারো ॥

কাল অনেক রাত পর্যন্ত জেগে কেসের খুঁটিনাটি পয়েন্ট নিয়ে ভেবেছে বিশ্বময়।

কোর্টের পর আর একবার সুমিতাদের বাড়ীতে যাবে ভেবেছিল কিন্তু আর যেতে হয়নি। কলেজের গেটেই দেখা হয়ে যায় সুমিতার সঙ্গে। অনেকক্ষণ বসে সুমিতার সঙ্গে কথা বলেছিল বিশ্বময়। শান্তনুকে বাঁচাতেই হবে। সে শান্ত নির্দোষ, তাঁর বাবাকে প্রদীপ দত্ত খুন করেছে। শান্তনুকে পথ থেকে সরাবার জন্য তার এই ষড়যন্ত্র ! এর জন্য শান্তনুকে ভুল বোঝার কোনো কারণ নেই।

প্রদীপ শান্তনুর নামে অনেক কথাই লাগিয়েছে। অন্য মেয়ের সঙ্গে জড়িত সে। সব ভুয়ো কথা। যে মেয়ের ফটো সে দেখিয়েছে, সে আর কেউ নয়, তার বোন। বীণা শান্তনুর অমঙ্গল চায় না। কোর্টে সে আসবে এবার। এবার কোর্টটা খুব গুরুত্বপূর্ণ হবে। সেও তৈরী হয়েছে সবদিক থেকে। এমন সব নাম আর পত্র সে হাত করেছে, যা প্রদীপ ধারণা করতে পারবে না।

—সত্যি আমাদের মাথার ঠিক ছিল না।

—না থাকাটাই স্বাভাবিক। তবে সামনের দিন নিজের বিবেকের উপর আস্থা রেখে কোর্টে আমার প্রশ্নের উত্তর দেবেন।

—আপনার কথা আমার মনে থাকবে।

—আপনার সর্বনাশ যা ঘটবার তা ঘটেছে। ভবিষ্যতে আর যাতে অঘটন কিছু না ঘটে, সেজন্যে আপনাকে প্রস্তুত থাকতে হবে।

—আপনার পরামর্শমতই কাজ করবো।

—আচ্ছা এবার ওঠা যাক।

॥ বারো ॥

সময় মতো আবার কোর্ট বসলো। বীণা এসেছে আজ কোর্টে। কোর্টের সুরুতেই বিশ্বময় উঠে দাঁড়ালো।

—ইওর অনার! সেদিন যে ফটোটা প্রদীপবাবু আমাদের দেখিয়েছিলেন আমি মাননীয় ধর্মাবতারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, এই মেয়েটির ফটোই সেটা।

বীণা সাক্ষীর কাঠগড়ায় এসে দাঁড়ায়। ওপাশে আসামীর কাঠগড়ায় শান্তনুকে দাঁড় করানো হয়েছে আগে থেকেই। কমলাকান্তবাবু এগিয়ে এলেন বীণা রায়ের কাছে।

—এটা কি আপনার ছবি?

—হ্যাঁ।

—আপনার সংগে আসামীর কি সম্পর্ক?

—ভাই আর বোনের। শান্তনুদা আমার দাদার বন্ধু। দাদার বন্ধু হিসাবে সে আমারও দাদা।

—প্রদীপবাবু এ ছবি পেলো কোথা থেকে?

—তা আমি জানবো কি করে? তবে আমি তাকে এ ছবি দিইনি। তিনি হয়তো গোপনে এ ছবি তুলে থাকবেন।

—আপনি প্রদীপবাবুকে চেনেন?

—খুব চিনি। তিনি আমাদের ক্লাবের মেম্বার।

অনেক দিন আগে তোলা ক্লাবের একটা গ্রুপফটো ফাইল থেকে বার করে বিশ্বময় বিচারপতির সামনে রাখলো। আর একটা

ফটোও সে বার করলো। প্রদীপের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে বীণা।

—ইওর অনার! এ পয়েন্ট নিয়ে আর ড্রিল করার কোনো প্রয়োজন নেই। প্রদীপবাবু যে সেদিন কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, বীণা রায়কে তিনি চেনেন না, সেটা মিথ্যে প্রমাণ হলো।

প্রদীপবাবু বীণা রায়কে শুধু চেনেন না, খুব ঘনিষ্ঠতা রয়েছে তার সংগে। অযথা মিথ্যে বলবার স্বভাব প্রদীপবাবুর যথেষ্ট রয়েছে।

বিশ্বময়ের জেরার সামনে প্রদীপ দত্ত এক কোণে চুপ করে বসেছিল। বীণা নেমে যায় কাঠগড়া থেকে।

বীণার অজান্তেই তার ড্রয়ার থেকে ফটো, চিঠি চুরি করে বিশ্বময়।

বিশ্বাস কি, বীণা যদি শেষ পর্যন্ত কোর্টে না আসে।

ইওর অনার! সুমিতা দেবীকে কয়েকটা প্রশ্ন করার আছে। সেদিন তাকে কোনো কথা জিজ্ঞাসা করা হয়নি।

সুমিতা দ্বিধা না করে আস্তে আস্তে উঠে এলো কাঠগড়ায়।

আপনি কোর্টে যা রিপোর্ট দিয়েছেন, তা কি সত্য? আমার মাননীয় বন্ধু আপনার সম্পর্কে যা ব্যক্ত করেছেন, তার সংগে কি আপনি একমত?

বিশ্বময়ের এ প্রশ্নে কমলাকান্ত বাবু বলেন,—এ প্রশ্ন অবান্তর। সুমিতা দেবীতো ছেলেমানুষ নন। তিনি তাঁর মত যা ব্যক্ত করেছেন, কোর্টের সামনে আমি তা বলেছি।

—সুমিতা দেবীর কাছ থেকেই আমরা তা শুনতে চাই।

—আচ্ছা সুমিতা দেবী! আপনি কি শান্তনুকে সেদিন খুন করতে দেখেছেন?

না। শব্দ শুনে আমি ঘরে ঢুকি। তারপর দেখি শান্তনু ও প্রদীপ দত্ত গেটের সামনে।

—শান্তনুর সংগে আপনার সম্পর্ক কি?

– আমি তাঁকে ভালবাসি। প্রদীপবাবুর কাছে এই ফটো দেখে আমি শান্তনুকে ভুল বুঝেছিলাম।

—তাহলে আপনার ধারনা শান্তনু আপনার বাবাকে খুন করেনি।

—না। শান্তনু বাবাকে খুব শ্রদ্ধা করত, বাবাও ওকে স্নেহ করত।

—প্রদীপবাবুর ওপর আপনার কোন দুর্বলতা ছিল ?

—না।

—আপনাকে আর বিরক্ত করবো না আপনি যেতে পারেন।

—ইওর অনার। প্রদীপবাবু যে মিথ্যা কথা বলতে খুব অভ্যস্ত, তার আর একটা অকাট্য প্রমাণ পেলাম। শান্তনুকে খুনের দায়ে জড়াতে একমাত্র প্রদীপবাবুই ইণ্টরেস্টড। শুধু প্রদীপবাবু কেন, বৃন্দাবনবাবু সরোজবাবু এবং পুলিশ পর্যন্ত বলেছে, জয়দেববাবুকে আসামী শান্তনুবাবুই খুন করেছ।

কমলাকান্তবাবু বললেন—তাঁদের কথাতো আমি অস্বীকার করছিনা। পুলিশ রিপোর্টে দেখা যায়, আসামীর কোটের পকেটে একটা গ্লাভ্‌স পাওয়া গেছে, সেটা হাতে দিয়ে জয়দেববাবুকে হত্যা করা হয়েছে। সব ঠিক আছে। কিন্তু কথা হচ্ছে, জয়দেববাবুকে হত্যা করার সময় গ্লাভ্‌সটা কার হাতে ছিল, শান্তনুর না প্রদীপবাবুর ?

—অবজেক্ট ইওর অনার, একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সম্পর্কে এই ধরণের জঘন্য ইঙ্গিত অশোভনীয়। প্রদীপবাবু কোর্ট ত্যাগ করতে বাধ্য হবেন।

আমার মাননীয় বন্ধু এবার আমার মতই উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন। প্রদীপবাবুকে একবার কাঠগড়ায় আসার অনুবোধ করছি।

—কোর্টের আবহাওয়ায় একটা থমথমে ভাব নেমে আসছে। প্রদীপ কাঠগড়ার দিকে এগিয়ে আসে। সে কাঠগড়ায় এসে দাঁড়ালে বিশ্বময় তার কাছে এগিয়ে আসে। আপনার বুদ্ধির প্রশংসা আমাকে আর একবার করতে হলো। বেশ বুদ্ধি খাটিয়ে কাজটা করেছিলেন। কিন্তু একটা মারাত্মক ভুল আপনার হয়ে গেছে।

—আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারছিনা। বলল প্রদীপ।

—বুঝতে পারবেন এবার, পুলিশ রিপোর্টে লেখা আছে এবং

মাননীয় ধর্মাবতারও দেখেছেন, গ্লাভসের মধ্যের আঙুলের মাথাটা সিগারেটের আগুনে একটু পুড়ে গেছে, চিন্তার মধ্যে এমন ডুবেছিলেন তখন খেয়াল করতে পারেননি আপনি।

—বাজে কথা। ও গ্লাভ্স আমার নয়, শান্তনুর হাতে পুড়েছে।

—আহা উত্তেজিত হচ্ছেন কেন, সিগারেট শান্তনু খায় না। সিগারেটের আগুনেই পুড়েছে। জোরের সঙ্গেই বলে বিশ্বময়।

—একটা সামান্য জিনিসের ওপর আমার বুদ্ধিমান তরুণ বন্ধু কেন এত গুরুত্ব দিচ্ছেন তা জানি না। শান্তনুবাবু যে সিগারেট খান না তার কোনো প্রমাণ আছে?

—নিশ্চয়ই আছে, ডাক্তারের সার্টিফিকেট রয়েছে।

বিচারপতির সামনে সার্টিফিকেটটা রাখে বিশ্বময়। বিশ্বময়ের কথা শেষ হয় না। সে আবার বলে· গ্লাভসের মধ্যে একটা শাঁখের আংটি ভাঙা অবস্থায় পাওয়া গেছে। মীনা করা শাঁখের আংটিটা প্রদীপবাবু সব সময় পরতেন। গলা টিপে ধরার সময় হাতের চাপে শাঁখের আংটিটা ভেঙে গ্লাভসের মধ্যে রয়ে যায়।

—প্রদীপবাবু যে শাঁখের আংটি পরতেন, তার প্রমাণ দিতে পারেন? কমলাকান্তবাবু চার্জ করেন বিশ্বময়কে।

—নিশ্চয়ই পারি, সুমিতা এবং তার মা স্বীকার করবেন এ কথা। বীণাও বলবে। তার ওপর প্রদীপবাবুর যে ফটো দুটো আমি কোর্টের সামনে রেখেছি, তাতেও আছে, আর একটা ছবি আমি আপনাদের দেখাচ্ছি, যেটা খুনের দু'দিন পর তুলেছি।

ফাইল থেকে আর একটা ফটো বার করে বিশ্বময়। প্রদীপ ঘুমিয়ে আছে তার ঘরে। জানালার পাশ থেকে ফটোটা তোলা। প্রদীপের ডান হাতে ব্যাণ্ডেজ জড়ানো।

আমি আমার মাননীয় বন্ধুকে অনুরোধ করছি, তিনি যেন প্রদীপ বাবুর ডান হাতের মধ্যের আঙুলটা দেখেন। আমার দেখা হয়ে

গেছে, আংটিটা ভেঙে কেটে যায়; এতদিনে শু কয়ে গেলও দাগটা একেবারে মুছে যায়নি, কমলাকান্তবাবু একেবারে নীরব।

—কমলাকান্তবাবুর হয়তো বলবার আর কিছুই নেই। কিন্তু আমার এখনও বলবার আছে। স্বর্গত জয়দেববাবু চাননি সুমিতার সংগে প্রদীপবাবুর বিয়ে হোক। প্রদীপবাবুর অনুরোধ তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। শান্তনুর ওপর ক্রোধবশতঃ প্রদীপবাবু জয়দেব বাবুকে হত্যা করেন। শান্তনু আসামী প্রমাণিত হবেই এটাই তিনি ধরে নিয়েছিলেন। সুমিতার মা'র মত ছিল তাদের এ বিয়েতে।

প্রদীপ দত্ত নীরব। তার সব চেষ্টা ব্যর্থ হলো।

বিশ্বময় প্রদীপকে সান্ত্বনা দেবার জন্য বলে—আপনি সুমিতাকে ভালবাসেন এটা ঠিক। ভালবাসা বজায় রাখতে গিয়ে মানুষ যেমন নিজের প্রাণ দিতে পারে, আবার তেমনি প্রাণ নিতেও কুণ্ঠা বোধ করে না। যে কোন মানুষের মধ্যেই এ রোগটা দেখা যায়।

জুড়ীদের সংগে একমত হয়ে বিচারপতি মহাশয় শান্তনুকে মুক্তির আদেশ দিলেন। প্রদীপ দত্ত খুনী প্রমাণ হওয়ায় তাকে দশ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিলেন।

হাসতে হাসতে শান্তনু বেরিয়ে এসে বিশ্বময়কে জড়িয়ে ধরে। বিশ্বময়ও বন্ধুকে বেকসুর খালাস করতে পারায় দুজনে আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়ে। সুমিতা আর বীণা দু'জনে শান্তনুর দু পাশে এসে দাঁড়ায়। ম্যানেজার হরগোপালবাবুও এসেছিলেন কোর্টে। তিনি হাসতে হাসতে এসে দাঁড়ালেন। সুমিতার মা আঁচল দিয়ে চোখের জল মুছতে থাকেন।

—আমাকে ক্ষমা করো বাবা, আমি বুঝতে পারিনি তোমাকে। কথা বলার আগে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে শান্তনু।

—আপনি কোনো অন্যায় করেননি মাসিমা।

॥ সমাপ্ত ॥